বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in/) – এর
কিছু বাছাই লেখার সংকলন

বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রথম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০১৫

দৈনন্দিন জীবনে রসায়ন

সোঁদা গন্ধ

বিস্ময়ের জীবজগৎ

মৌমাছির খাবার খোঁজা

বিজ্ঞানের খবর

ডিরাক মেডেলে সম্মানিত বিজ্ঞানী অশোক সেন

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়

পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে

আরো থাকছে - ধাঁধা ও অন্যান্য প্রবন্ধ!

যারা বিজ্ঞান ভালবাসে, বা
ভয় পায় তাদের জন্য ...

বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রথম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, ২০১৫

bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানতেঃ

ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

সোঁদা গন্ধ
- পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী ০৫

পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে ০৭
- রাজীবুল ইসলাম

ধাঁধা - গলিগনের খোঁজ ১৭
- দেবায়ন সেন

মৌমাছির খাবার খোঁজা ১৪
- সুমন্ত্র সরকার

প্রথম চাষীর দল - পাতা কাটা পিঁপড়ে ২২
- অনিন্দিতা ভদ্র

দেড় দশকের বিজ্ঞান বলা ১৮
- মানস প্রতিম দাস

ধূমকেতু চত্বরে ২৭
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডিরাক মেডেলে সম্মানিত বিজ্ঞানী অশোক সেন ২৫
- পল্লব বসু

বিস্ময়ের নাম হ্যালডেন ৩১
- মানস প্রতিম দাস

সম্পাদকীয়

বাংলায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের পত্রিকা 'বিজ্ঞান' (http://bigyan.org.in) তার পথচলার প্রথম দেড় বছর পূর্ণ করল। মাত্র আঠারো মাস হয়তো কোন পত্রিকার সাবালক হওয়ার পক্ষ্যে যথেষ্ঠ নয়। কিন্তু তাও একটু একটু করে আমরা এগিয়েছি বেশ অনেকটাই। সে কাজ সম্ভব হত না এত উৎসাহী গবেষক-লেখক, স্বেচ্ছাসেবী এবং সর্বোপরি পাঠকদের সাথে না পেলে।

সমাজের উন্নতিতে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন বিতর্কের অতীত। তার জন্য দরকার সেই সমাজের নিজের ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার পরিবেশ। বিজ্ঞান প্রকৃতির ভাষা বোঝার চেষ্টা করে। সুবিধের খাতিরে গবেষণার কাজ আমরা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করি, কারণ আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখতে এর বিকল্প এখনো নেই। কিন্তু সেই গবেষণার কথা আমরা কোন স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীকে তার মাতৃভাষায় বোঝাতে পারব না কেন? আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আর সমস্যার কথা না জানলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আর ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আনন্দযজ্ঞের শরীক না হলে সেই সমাজ ভবিষ্যতে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ হিসেবে গড়ে উঠবে এমন আশা না করাই ভাল। এই উদ্দেশ্যে অনেক বিজ্ঞানী মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের কাজ করে যান। 'বিজ্ঞান' সেই প্রচেষ্টাকে আরো অনেক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম।

কোন বিষয়কে সহজ করে অথচ নির্ভুলভাবে বোঝাতে পারা খুব শক্ত। তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সেই বিষয় সম্বন্ধে নিজের পরিচিতি, অনেক ভাবনাচিন্তা। 'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত বেশিরভাগ লেখাই লিখেছেন এমন লেখক যারা সরাসরি গবেষণার সাথে যুক্ত, বা সেই বিষয় নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। লেখাগুলি প্রকাশিত হওয়ার আগে সেই বিষয়ের গবেষকদের মতামত নেওয়া হয়েছে, যাতে যথাসম্ভব সঠিকভাবে এবং সহজভাবে বিষয়গুলির অবতারণা করা যায়। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা এত বাঙালী গবেষকদের এক মঞ্চে এনে এমন আড্ডার নিদর্শন খুব বেশী নেই।

'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে থেকেই বাছাই করা কিছু লেখার সংকলন নিয়ে হাজির 'বিজ্ঞান পত্রিকা'। আপাতত তিনমাসে একবার করে এটি প্রকাশিত হবে 'বিজ্ঞান'-এর ওয়েবসাইটেই। আমাদের আশা পাঠকেরা এই পিডিএফ পত্রিকাটি ভাগ করে নেবেন অনেকের সাথে। বিশেষত স্কুলের মাষ্টারমশাইরা যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য রীডিং-বোর্ডে এই পত্রিকাটির প্রিন্ট আউট প্রদর্শন করেন তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সার্থক হবে। পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেতে bigyan.org.in@gmail.com -এ ইমেইল করুন। আর যারা 'বিজ্ঞান'-এর লেখাগুলির নিয়মিত পাঠক তারা আরেকবার পড়ে নিন লেখাগুলো! ইমেইলে মতামত জানাতে ভুলবেন না।

আজ, ভারতের শিক্ষক দিবসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যায় রইল কিছু অত্যাশ্চর্য বিষয়ের কথা - যেমন মৌচাকের অন্য মৌমাছিদের পরাগরেণুর সংবাদ দেওয়ার জন্য মোমাছির নাচ, বৃষ্টিভেজা মনকেমন করা সোঁদা গন্ধের বৈজ্ঞানিক কারণ, কীভাবে আলো দিয়ে পদার্থকে ঠান্ডা করা যায় পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে, গাছেদের জগতে হিংসে-মারামারির কাহিনী ইত্যাদি। সেই সাথে থাকছে কিছু ইতিহাস, বিজ্ঞানের খবর, ধাঁধা ইত্যাদি।

আসুন, 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র সাথে আরেকবার বিজ্ঞানের মজা উপভোগ করি, মাতৃভাষা বাংলায়!

সম্পাদকমন্ডলী, 'বিজ্ঞান'
৫-ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (এম.আই.টি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় , কেমব্রিজ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র (NGO পদক্ষেপ)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- সূর্যকান্ত শাসমল (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার)

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র সম্পাদনা - সূর্যকান্ত, অনির্বাণ, কুণাল ও রাজীবুল।

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ছবি: পথের পাঁচালী

সোঁদা গন্ধ

পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

"একদিন বৃষ্টিতে বিকেলে
থাকবেনা সাথে কোন ছাতা,
শুধু দেখা হয়ে যাবে মাঝ রাস্তায়
ভিজে যাবে চটি-জামা-মাথা,
থাকবেনা রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া
দোকান-পাট সব বন্ধ
শুধু তোমার আমার হৃদয়ে
ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।"

— অঞ্জন দত্ত

প্রথমেই আমেজটা তৈরি করে নেওয়া যাক। গানের লাইনগুলো মনে পড়ছে? তোমাদের কম্পিউটারে এই গানটা নেপথ্যে চলতে থাকুক। ভাবছ এত গৌরচন্দ্রিকা কিসের জন্য? শুধু তোমাদের একটু সোঁদা গন্ধটা মনে করিয়ে দিতে চাইছি, পাছে ভুলে গিয়ে থাকো। গরমকালে দুপুরবেলা জানালার পাশে বসে আছ হয়ত। আকাশ কালো করে এসেছে, বৃষ্টি নামবে এখুনি। বলতে বলতেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ নাকে এলো সেই অদ্ভুত মায়া জড়ানো গন্ধ ... সোঁদা গন্ধ।

কত কবি, কত গীতিকার এই সোঁদা গন্ধ নিয়ে কবিতা, গান লিখেছেন। গরমকালে কত সময় এই গন্ধের জন্য অপেক্ষা করে থেকেছি। তোমরা নিশ্চয় একমত হবে এ ব্যাপারে।

কিন্তু এই গন্ধ এলো কোথা থেকে? মাটির কি নিজের গন্ধ হয় নাকি? অনেকে বলেন রোদ্দুরে তেতেপুড়ে থাকা মাটি জল পেয়ে এমন বাষ্প তৈরি করে। হবে হয়ত। কিন্তু তার এমন গন্ধ কেন? ভাবার বিষয় বটে। এটাও নিশ্চয় শুনেছ যে উট

মরুভূমিতে ঠিক মরূদ্যান খুঁজে বার করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো করে কি ভাবে?

১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানীরা প্রথম একটি রাসায়নিক যৌগপদার্থের সন্ধান পান যা একটিনোমায়সিটিস গোত্রের ব্যাক্টিরিয়ারা তৈরি করে থাকে। সেই যৌগটির রাসায়নিক গঠন নিচে দেওয়া হলো। বাঁদিকের ছবিটাকেই ত্রিমাত্রিক ভাবে আঁকলে ডানদিকের ছবির মত দেখায়।

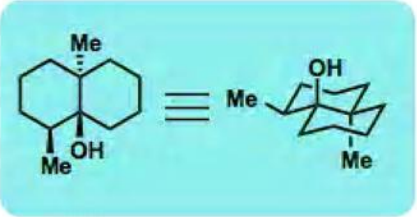

এর নাম জিওস্মিন (geosmin)। মজার ব্যাপার হলো আমরা এই জিনিসটি বাতাসে খুব অল্প পরিমাণে থাকলেও গন্ধ পাই। সঠিকভাবে বলতে গেলে বাতাসে একশ কোটি ভাগের এক ভাগ (1 part per billion) থাকলেও এর গন্ধ পাওয়া যায়। আর উট অথবা অন্য বহু প্রাণী তো আরো বেশি করে এর গন্ধ পায়। কিন্তু তোমরা হয়ত জিগ্যেস করবে তাহলে বৃষ্টির সময় ছাড়া এর গন্ধ পাই না কেন? আসলে যে ব্যাক্টিরিয়া জিওস্মিন তৈরি করে তারা মাটিতে বাস করে, মাটির মধ্যেই তাদের জীবনাবসান ঘটে, আর বৃষ্টির জল পড়লে তাদের মৃত কোষগুলো থেকে জিওস্মিন বেরিয়ে আসে। তখন আমরা গন্ধটা পাই। এটাও লক্ষ্য কোরো যে শুকনো আবহাওয়ার মধ্যে বৃষ্টি পড়লে এর গন্ধ আরো বেশি করে পাওয়া যায়। তার কারণ হলো শুকনো আবহাওয়াতে অন্য জৈবপদার্থের পরিমাণ কম থাকে তাই অন্য গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না।

জিওস্মিন আবিষ্কারের পর বেশ কয়েক দশক কেটে গেছে। বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে উৎসেচকটিকেও খুঁজে বার করেছেন যা এই অণুটি তৈরি করে। গবেষণাগারে তাঁরা সেই উৎসেচকের রাসায়নিক কিছু পরিবর্তন করে জিওস্মিন তৈরি করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন । এর ফলে কি হতে পারে ভাবো। সোঁদা গন্ধ আর পাবে না ঠিকই কিন্তু অনেক সময় জিওস্মিন পানীয় জলে মিশে গিয়ে যে জলদূষণ হয় তা থেকে বাঁচা যাবে। কিন্তু সোঁদা গন্ধ না পেলে তোমাদের মন খারাপ করবে না?

ভারতের নানা জায়গায় বেশ কিছু দেশীয় সুগন্ধি দ্রব্য তৈরির শিল্প গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তী কিছু বছরের মধ্যে। তারা গরমকালে মাটি শুকিয়ে তারপর বর্ষার আগে বাষ্প পাতন-(steam distillation) করে সেই বাষ্প চন্দনের তেলে মিশিয়ে নিত আর তারপর সেই তেল বিক্রি করত বাজারে। উত্তর প্রদেশে এর জনপ্রিয় নাম ছিল "মিট্টি কি আতর"। এখনো সেই তেল পাওয়া যায় কিনা অবশ্য বলতে পারব না।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2014/04/06/sonda-gandho/
(লেখাটি ৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

পদক্ষেপ (http://padakshep.org/) একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে।

পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে

রাজীবুল ইসলাম

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

এক

ছোটোবেলা বিজ্ঞানের বইতে পড়েছি যে একটা গ্যাসের তাপমাত্রা কমতে কমতে প্রায় -273 ডিগ্রী সেলসিয়াসে এসে পৌঁছলে তার আয়তন শূন্য হয়ে যায়। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় পরমশূন্য তাপমাত্রা। তাত্ত্বিকভাবে তো কত কিছু বলা যায়, কিন্তু এই তাপমাত্রায় কি সত্যি সত্যিই পৌঁছনো সম্ভব? আর সত্যি সত্যিই কি গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায়?

বেশীরভাগ গ্যাসকেই ঠাণ্ডা করতে থাকলে একটা তাপমাত্রায় এসে তরল আর তারপর কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষাগারের বিশেষ অবস্থায় কিছু গ্যাসকে (মূলত যাদের অণুতে একটি করে পরমাণু থাকে) তরলে পরিণত না হতে দিয়েই পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। একটি বদ্ধ স্থির পাত্রের মধ্যে রাখা কোন গ্যাসীয় পদার্থের অণু পরমাণুগুলো নানান গতিবেগে নানান দিকে অনবরত ছুটতে থাকে। তাপমাত্রা হল গ্যাসের অণু পরমাণুগুলোর এই গতিশক্তির পরিমাপ। ঘরের তাপমাত্রায় এই গতির মান (দ্রুতি বা Speed) গড়ে প্রায় সেকেণ্ডে কয়েকশ' মিটার হয়- যত হাল্কা গ্যাস তত বেশী এই দ্রুতি। তাপমাত্রা কমানো মানে গ্যাসের মধ্যেকার পরমাণুদের এই গতি কমিয়ে দেওয়া। এই প্রবন্ধের অবতারণা সেই ঘটনা বলার জন্য - ঠিক কিভাবে ঘরের তাপমাত্রার একটা গ্যাসকে এত ঠাণ্ডা করা যায়, আর ওই ঠাণ্ডায় পদার্থের আচরণ-ই বা কেমন হয়।

আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েই শুরু করি। হ্যাঁ, পরমশূন্যের খুব কাছাকাছি তাপমাত্রায় পৌঁছনো সম্ভব। কত কাছাকাছি? ল্যাবরেটরিতে সবথেকে ঠাণ্ডা যে পদার্থ তৈরী করা গিয়েছে তার তাপমাত্রা হল কয়েক ন্যানোকেলভিন বা আরো কিছুটা কম (পিকোকেলভিন)। পদার্থবিজ্ঞানীরা তাপমাত্রা মাপতে কেলভিন (K) স্কেল ব্যবহার করে। সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার সাথে 273 ডিগ্রী যোগ করলেই কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা পাওয়া যায়। অর্থাৎ শূন্য কেলভিন হচ্ছে পরমশূন্য তাপমাত্রা। আর আমাদের অত্যন্ত আরামদায়ক 'ঘরের তাপমাত্রা' 27 ডিগ্রী সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলে হবে 300 K ।

এই ন্যানোকেলভিন কত ছোট তাপমাত্রা? খুলে লিখলে হবে 0.000 000 001 K। এক কেলভিনের একশো কোটি ভাগের একভাগ। এই সংখ্যাটা কত ছোট তা ঠিকভাবে ধারণা করা একটু মুস্কিল। আমরা ডাক্তারী থার্মোমিটারে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা মাপতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই ন্যানোকেলভিন কতটা ঠাণ্ডা ঠিকমত বোঝাতে এত ছোট থার্মোমিটারে হবে না। একটা পেল্লায় লম্বা থার্মোমিটারের কথা ভাবা যাক। কয়েক হাজার কিলোমিটার লম্বা সেই থার্মোমিটার, ভারতের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর, তার গায়ে তাপমাত্রার স্কেল আঁকা আছে। ধরা যাক এই থার্মোমিটারের শুরু, অর্থাৎ পরমশূন্য তাপমাত্রা হল স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে যেখানে বসে ধ্যান করেছিলেন সেখানকার একটা নির্দিষ্ট কোন বিন্দুতে, আর 'ঘরের তাপমাত্রা' হল একদম শ্রীনগরে! সেই হিসেবে জল যে তাপমাত্রায় জমে বরফ হয় অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস বা 273 K হবে হিমাচল প্রদেশের উত্তরের দিকে। যে তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন জমে তরল হয় (77 K বা -196 ডিগ্রী সেলসিয়াস) তা হবে কর্ণাটকের মাঝামাঝি। হিলিয়াম তরল হয় 4 K বা -269 ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি- আমাদের বিশাল থার্মোমিটারের স্কেলে সেটা হবে কন্যাকুমারী থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। আর এক ন্যানোকেলভিন (1 nK)?

তা হবে থার্মোমিটারের শূন্য অর্থাৎ পরম শূন্য তাপমাত্রা (0 K) যে বিন্দুতে তার থেকে মানুষের মাথার চুল যতটা চওড়া (প্রায় 30 মাইক্রন বা 0.03 মিলিমিটার) তার প্রায় একের তিনভাগ দূরে!

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখা ভালো যে পরীক্ষাগারে কোন পদার্থকে এত কম তাপমাত্রায় খুব অল্প সময়ের জন্যই রাখা যায়। মহাবিশ্বের কোন জায়গার তাপমাত্রা 2.7 কেলভিনের কম খুব বেশী সময় ধরে থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে আরো জানতে উৎসাহী পাঠক কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সম্বন্ধে ইন্টারনেটে খোঁজ করতে পারেন।

এবার বলি ঘরের তাপমাত্রা থেকে এত ঠাণ্ডায় কি করে আসা যায়, তার রহস্য। বাজারে মাছকে ঠাণ্ডা রাখতে বরফে ঢেকে রাখা হয়। পরীক্ষাগারে আরো কম তাপমাত্রা লাগলে তরল নাইট্রোজেন বা তরল হিলিয়াম দিয়ে পরীক্ষার ওই অংশকে ঢেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এত সব করেও কোনো পদার্থকে 0.001 K বা মিলিকেলভিনের কম তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া এখনো সম্ভব নয়। কোনো গ্যাসীয় পদার্থকে আরো কম তাপমাত্রায় নিয়ে যেতে হলে ব্যবহার করা হয় আলোকের! শুনতে ধাঁধাঁর মত লাগছে? গরমকালের সূর্যের আলোর তাপে তো আমরা জেরবার হয়ে যাই - সেই আলোকে ব্যবহার করেই কোন পদার্থকে ঠাণ্ডা করা যায় নাকি? সে আবার কী করে সম্ভব?

এই লেখার পরের অংশে সেই কৌশলের কথা বলব।

আলো দিয়ে ঠান্ডা

লেজার কুলিংএর অন্যতম পথিকৃত বিজ্ঞানী ডেভিড - ওয়াইনল্যান্ড ও হান্স ডেমেল্ট।
ছবি : wikipedia/NIST and nobelprize.org

আলো যেহেতু একটা তরঙ্গ, তাই তার কম্পাঙ্ক নির্ভর করে যে দেখছে তার গতিবেগের উপরে। ঠিক ধরেছেন, এ হল ডপলারের প্রভাব, যেমন শব্দের ক্ষেত্রে হয়। সেই সাথে যোগ করুন আরো দুটি তথ্য – পরমাণু খুব নির্দিষ্ট কিছু কম্পাঙ্কের আলোই শোষণ করে, আর আলোর ভরবেগ আছে। এই নিয়মগুলোকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করলেই আলো ফেলে গ্যাসীয় পদার্থকে ঠান্ডা করে দেওয়া যায়!

ভাবছেন, এ সব কী বলছি আবার? "চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা - হল চশমা"? তাহলে ধৈর্য ধরে বসুন - প্রথমে পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয় একটু গল্পচ্ছলে বুঝে নিই।

ডপলারের প্রভাব

রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে হর্ণ দিতে দিতে রেলগাড়ির চলে যাওয়া আমরা প্রায় সকলেই দেখেছি। অপু-দুর্গার সেই দৃশ্য তো অমর হয়ে আছে। ধরা যাক অপু আর দুর্গা কাশবনের মধ্যে রেললাইন থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, আর রেলগাড়িটা হর্ণ দিতে দিতে সোজা লাইন দিয়ে এগিয়ে আসছে। এখন প্রশ্ন করা যাক, ওই হর্ণের সুর (বিজ্ঞানের ভাষায় শব্দতরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি) গাড়ির চালক যেমনটি শুনবে, অপু-দুর্গা কি ঠিক তেমনটিই শুনবে? উত্তরটা হল, না! অপু-দুর্গা যদি হর্ণের কম্পাঙ্ক শোনে $\nu_{observer}$ আর চালক যদি শোনে ν_{source} তাহলে,

$\nu_{observer} > \nu_{source}$ (রেলগাড়ি এগিয়ে আসছে, অপু-দুর্গা বেশি তীক্ষ্ণ সুর শুনছে।)

রেলগাড়ি যত কাছাকাছি আসতে থাকবে অপু-দুর্গার শোনা হর্ণের কম্পাঙ্ক ততই কমতে থাকবে, যদিও তা চালকের শোনা সুরের থেকে তখনও বেশী। ঠিক যখন ওদের সামনে রেলগাড়ির চালকের কামরা এসে হাজির তখন তিনজনেই একই কম্পাঙ্কের সুর শুনবে। এরপর রেলগাড়িটি যখন হুস করে তাদের সামনে দিয়ে চলে যাবে তখন ঐ দুই ভাই-বোন যে হর্ণের সুর শুনবে তা চালকের শোনা সুরের থেকে ক্রমশ নীচুর বা খাদের দিকে নামতে থাকবে।

$\nu_{observer} < \nu_{source}.$ (রেলগাড়ি দূরের দিকে চলে যাচ্ছে, চালক বেশি তীক্ষ্ণ সুর শুনছে।)

কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক নির্ভর করে তরঙ্গের উৎস ও পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির উপরে - এই ঘটনাকে ডপলারের প্রভাব বলে। সব তরঙ্গের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা দেখা যায়। শব্দের যেমন, আলোক তরঙ্গেরও তেমন।

কোন পরমাণুর উপর আলোক রশ্মি ফেলা হলে পরমাণুটি তার কম্পাঙ্ক কি দেখবে, তা নির্ভর করবে পরমাণুর বেগের উপর। (আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক তার রঙ ঠিক করে দেয়। সব কম্পাঙ্কের আলো যদিও আমরা দেখতে পাই না।) এই ঘটনাটিকেই কাজে লাগিয়ে কোন গ্যাসীয় পদার্থের উপর আলো ফেলে তাকে ঠান্ডা করে ফেলা যায়! ঠিক কিভাবে তা বুঝতে হলে পরমাণুর উপর আলো ফেললে কি হয় তা একটু বুঝতে হবে।

পরমাণুর উপর আলোর প্রভাব

আসুন এবার পরমাণুর অন্দরমহলের গল্প শুনে নিই। সহজ করে বললে, পরমাণুর কেন্দ্রে একখানা পুচকে কিন্তু খুব ভারী নিউক্লিয়াস, আর তার বাইরে বনবন করে নানান সাইজের কক্ষপথে ঘুরছে কতকগুলি ইলেকট্রন। কক্ষপথের আকার যত বড় ইলেকট্রনের শক্তিও তত বেশী।

পরমাণুর উপরে আলো ফেললে এই ইলেক্ট্রনগুলো আলো থেকে শক্তি শোষণ করে 'জাম্প' মেরে উপরের কক্ষপথে চলে যেতে পারে! আলো জিনিসটা ঠিক কী, তা নিয়ে আলোচনা অন্য কোন লেখায় করা যাবে। আপাতত আমাদের আলোচনার জন্য এটুকু ধরলেই যথেষ্ট যে আলোক তরঙ্গ অনেক আলোক কণিকা বা ফোটন দিয়ে তৈরী। যেমন পুকুরের জলের তরঙ্গে অনেক জলের অণু থাকে, তারা জলতরঙ্গের সাথেই কাঁপতে থাকে, তেমনি আলোর মধ্যে ফোটন, তারাও আলোক তরঙ্গের সাথে কাঁপে। যে আলোর কম্পাঙ্ক যত বেশী (যেমন নীল আলোর কম্পাঙ্ক লালের থেকে বেশী), তার ফোটনের শক্তিও তত বেশী।

এবার ধরুন 'ফ্যাৎ ফ্যাৎ সাঁই সাঁই' করে একঝাঁক ফোটন গিয়ে আছড়ে পড়ল এক পরমাণুর উপর। পরমাণুরা কিন্তু খুব হিসেবি – তারা যে সে ফোটন 'খায়' না। যে ফোটনের শক্তি শোষণ করে ইলেকট্রন উপরের কোন নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে যেতে পারে, সেই কম্পাঙ্কের ফোটনই পরমাণুদের পছন্দ। এই বিশেষ কম্পাঙ্কগুলোকে রেসোন্যান্স কম্পাঙ্ক (Resonance frequency) বলে। ফোটনের ভাগাভাগি হয় না, খেতে গেলে একখানা আস্তই খেতে হবে, তাই আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যদি এক কোটি ভাগের একভাগও পালটে যায় তাহলেই পরমাণুর সেই ফোটনে অরুচি জন্মায় - কারণ ঐ ফোটনের মধ্যে ইলেকট্রনের অন্য কক্ষপথে যাওয়ার জন্য ঠিক যে শক্তি দরকার তা নেই! সেই কারণে কোন পরমাণুকে উত্তেজিত করতে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোর উৎস, যেমন লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

আরেকটি মজার তথ্য হল **আলোর ভর না থাকলেও ভরবেগ আছে!** অর্থাৎ যখন কোন পরমাণু একটা আলোক কণিকা শোষণ করে, তখন সেই আলোক কণিকা তাকে শক্তির সাথে সাথে ভরবেগজনিত একটা ধাক্কাও দেয়। মেসির শট্ ধরতে গিয়ে গোলকিপার যেমন ধাক্কা খায়! পাঠক যদি ঘাবড়ে গিয়ে থাকেন আলোর ভরবেগের কথা শুনে, তাহলে শুধু এটুকুই বলি এখানে যে ছোটবেলায় যে 'ভরবেগ সমান ভর গুণিতক বেগ'-এর সূত্র

শিখেছিলাম, তা সবার ক্ষেত্রে খাটে না, যেমন ভরহীন আলোর ক্ষেত্রে!

তাহলে আমরা তিনটি নীতি শিখলাম :

১. আলোর কম্পাঙ্ক নির্ভর করে দর্শকের গতিবেগের উপর।

২. পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলো কিছু নির্দিষ্ট শক্তির বা কম্পাঙ্কের আলোক কণিকা বা ফোটন শোষণ করতে পারে।

৩. ফোটনের যেহেতু ভরবেগ আছে তাই পরমাণু ফোটন শোষণ করতে গিয়ে ধাক্কা খায়।

এবার ধরা যাক, একটি পরমাণুর উপর লেজার রশ্মি ফেলা হচ্ছে একদিক থেকে। লেজার রশ্মিটির কম্পাঙ্ক হল রেসোন্যান্স কম্পাঙ্কের থেকে একটু কম। তাহলে যে পরমাণু স্থির আছে সে প্রায় কোন আলো শোষণ করবে না। যে পরমাণুগুলো ঐ আলোক রশ্মির সাথে একই দিকে ছুটছে তাদের কাছে ডপলারের প্রভাবের ফলে ঐ আলোর কম্পাঙ্ক আরো কমে যাবে, অর্থাৎ রেসোন্যান্স থেকে আরো দূরে সরে যাবে - তাই তাদের পক্ষে ঐ আলোক কণিকাদের শোষণ করার সম্ভাবনা আরও কম। কিন্তু যে পরমাণুগুলো আলোকরশ্মির বিপরীতে অর্থাৎ উৎসের দিকে ছুটছে তারা ডপলারের প্রভাবের ফলে আলোর কম্পাঙ্ক একটু বেশী দেখবে, অর্থাৎ তাদের মনে হবে যে আলোর কম্পাঙ্ক বেড়ে রেসোন্যান্স কম্পাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে! তারা বলবে- চমৎকার, ধরা যাক দু-একটা ফোটন এবার! আর যেই একটা ফোটন খাবে, অমনি সেই মেসির শটের মত ধাক্কা - সেই ধাক্কায় তাদের বেগ যাবে একটু কমে। খানিক বাদে ওই পরমাণুর ইলেকট্রন আবার নেমে আসবে নিচের কক্ষপথে, আবার একটা ফোটন খাবে, আবার ধাক্কা, আবার বেগ কমবে একটু। এমনি করে তার বেগ আর সেই সাথে গতিশক্তি কমতেই থাকবে। আগেই বলেছি গড় গতিশক্তি কমা মানে তাপমাত্রা কমা, অর্থাৎ যে পরমাণুগুলো লেজারের দিকে ছুটছিল তারা ঠান্ডা হতে থাকবে। অনেকটা পরের পাতার ছবির মত।

এবার একই ভাবে উল্টো দিক থেকে রেসোন্যান্সের থেকে কম কম্পাঙ্কের আলো ফেললে যে পরমাণুগুলো উল্টোদিকে ছুটছিল তারাও ঠান্ডা হয়ে যাবে! তাহলে মোট ছ'টা লেজার রশ্মি ব্যবহার করে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-উপর-নিচ সব দিকে ছোটা পরমাণুর দল ঠান্ডা হয়ে যাবে।

এই ঘটনাটাকে বলা হয় লেজার কুলিং (Laser Cooling) বা লেজার শীতলিকরণ। 1978 সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড ও সহকর্মীরা ম্যাগনেসিয়াম আয়নকে এবং হান্স ডেমেল্ট ও সহকর্মীরা বেরিয়াম আয়নকে লেজার কুলিং করে দেখান। এই পদ্ধতিতে গ্যাসের তাপমাত্রা কমিয়ে কয়েকশ' মাইক্রোকেলভিন পর্যন্ত আনা যায় (এক মাইক্রোকেলভিন = 0.000 001 কেলভিন)। পরবর্তী কালে মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম ফিলিপ্স ও স্টিভেন চু এবং ফরাসী বিজ্ঞানী কোহেন তানৌজ্জি ও তাদের সহকর্মীরা এই পদ্ধতিকেও আরো এগিয়ে নিয়ে যান - তাপমাত্রা কমিয়ে কয়েক মাইক্রোকেলভিন অব্দি নিয়ে চলে যান, এবং সঠিক ব্যাখ্যা করেন। উপরে যে সব বিজ্ঞানীর নাম করলাম তারা সবাই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নানা সময়ে।

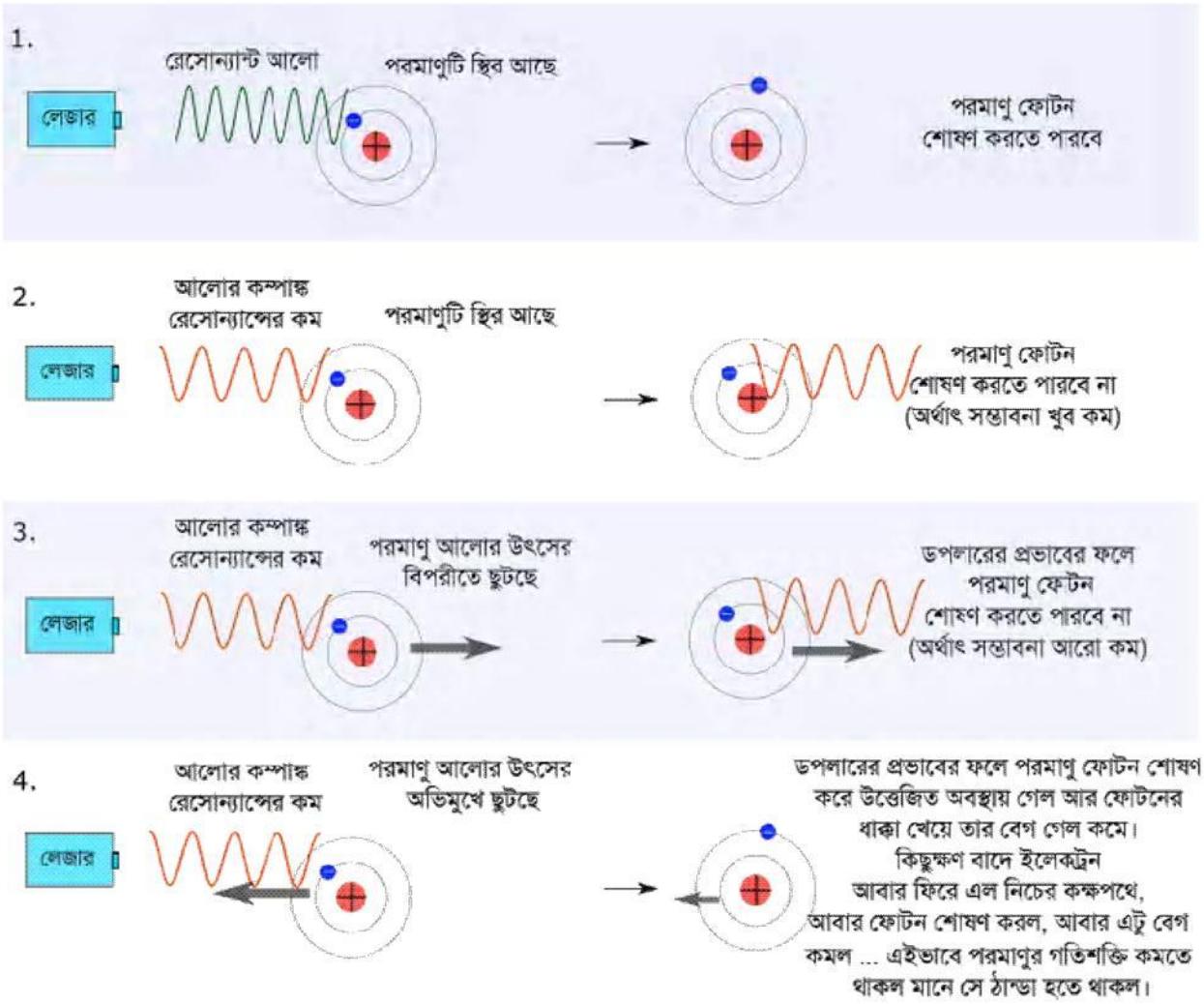

ছবি :1. নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের বা Resonant frequency-র আলোক কণিকা শোষণ করে পরমাণুর ইলেকট্রন বেশি শক্তির কক্ষপথে চলে যেতে পারে। 2-4. Resonant frequency-র থেকে কম কম্পাঙ্কের আলো শোষণ করার সম্ভাবনা খুবই কম, যদি না পরমাণুটি আলোর উৎসের দিকে নির্দিষ্ট বেগে ছুটতেথাকে , আর ডপলারের প্রভাবের ফলে আলোর কম্পাঙ্ক বেড়ে গিয়ে Resonant frequency-র সমান বা খুব কাছে দেখে। পরমাণুটি সেক্ষেত্রে একটা আলোক কণিকা শোষণ করে। সেই সাথে আলোক কণিকার ধাক্কা খেয়ে পরমাণুর বেগ এবং গতিশক্তি কমে যায়। এটাই হল আলো দিয়ে পদার্থকে ঠান্ডা করার একটি কৌশল যা Laser cooling নামে পরিচিত।

আজ এখানে থামব, কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয় – লেজার কুলিং-এর পরেও পদার্থকে আরো অনেক ঠান্ডা করা যায়। করতে করতে তাপমাত্রা এমন কমে যেতে পারে যে ঐ গ্যাস সম্পূর্ণ এক নতুন অবস্থায় চলে যেতে পারে। যেখানে পরমাণুগুলোর কে কোথায় আছে আলাদা করে চেনা যায় না, সবাই সব জায়গায় একসাথে থাকতে পারে, তাও কেউ কাউকে ধাক্কা মারে না! এই অদ্ভুত অবস্থার সাথে এক বাঙালী বিজ্ঞানীর নাম জড়িয়ে আছে - সত্যেন্দ্রনাথ বসুর। আইনস্টাইনের সাথে বরেণ্য

বাঙালী বিজ্ঞানীর নামে পদার্থের এই অবস্থার নাম বোস-আইনস্টাইন কন্ডেনশেসন।

এই লেখার শেষ অংশ পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। কিন্তু অন-লাইন তার আগেই পড়ে ফেলতে দেখুন –

http://bigyan.org.in/2014/05/29/paramshunyo-tapmatrar-kachhe/

প্রচ্ছদের ছবিটি রুবিডিয়াম গ্যাসের। তাপমাত্রা কয়েক মাইক্রোকেলভিন বা তারও কম। এক মাইক্রোকেলভিন হল এক কেলভিনের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ। এত কম তাপমাত্রা বলে পরমাণুগুলি প্রায় স্থির (ছবিতে সবুজ বিন্দুর মত), আর তাই তাদের ছবি তোলা সম্ভব। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ান্টাম গ্যাস মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রে তোলা।

ডঃ কাজী রাজীবুল ইসলাম হার্ভার্ড-এম.আই.টি সেন্টার ফর আল্ট্রাকোল্ড অ্যাটমস-এর পোস্ট-ডকটরাল গবেষক। গবেষণার বিষয় – পরমশূন্য তামপাত্রার কাছে পদার্থের অবস্থা এবং কোয়ান্টাম ইনফরমেশন। এর আগে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রাজীবুল http://bigyan.org.in ('বিজ্ঞান') এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

মৌমাছির খাবার খোঁজা

সুমন্ত্র সরকার

ব্র্যান্ডাইস ইউনিভার্সিটি, ম্যাসাচুসেটস

পশু-পাখি, পোকা-মাকড় এরা খাবার পায় কোথা থেকে? আমাদের মতো এদের তো আর পাড়ার মুদির দোকান নেই, তাই এদেরকে খাবার খুঁজতে হয়। খাবার খোঁজাকে ইংরেজীতে বলে ফোরেজিং (Foraging)। যেমন ধরো, তোমরা দুর্গাপূজোর সময় এগরোলের দোকান খুঁজে বেড়াও, খুঁজে বেড়াও কোথায় সবথেকে ভালো ফুচকা পাওয়া যায়, বা কুকুর বিড়ালরা বাড়ি বাড়ি কাঁটাটা-কুটোটা খুঁজে বেড়ায়, একেই বিজ্ঞানীরা বলেন ফোরেজিং। মানুষ, কুকুর, বিড়ালরা এদের একলা-একলাই জীবন কাটে, বাঁচার জন্য সাধারণত কারোর ওপর নির্ভর করতে হয়না। তাই এইসমস্ত প্রাণীদের বিজ্ঞানীরা বলেন সলিটারী বা একান্তবাসী জীব। আবার পিঁপড়ে, মৌমাছিরা একা একা কখনো বাঁচতে পারে না, একটা মৌমাছির চাকের বাসিন্দারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই এদেরকে বলা হয় সোশ্যাল বা সামাজিক জীব। তোমরা হয়ত জানো যে একটা মৌমাছির চাকে মূলত তিন ধরণের মৌমাছি থাকে – রানী, পুরুষ আর কর্মী মৌমাছি। রানী মৌমাছি আর পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ হলো বংশ বিস্তার করা। খাবার জোগাড়, ডিম-বাচ্চাদের লালন-পালন, মৌচাককে শত্রুদের থেকে রক্ষা করা, রানী ও পুরুষ মৌমাছিদের পরিষ্কার রাখা, এই সবকিছুরই দায়িত্ব হলো কর্মী মৌমাছিদের। স্বাভাবিক ভাবেই একটা কর্মী মৌমাছির পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়, তাই এক এক দল কর্মী মৌমাছি তাদের কাজ ভাগ করে নেয়। আমি আজকে যাদের কথা বলব তাদের কাজ

হল খাবার খোঁজা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এদের বলে ফোরেজার বা জোগাড়ে মৌমাছি।

খাবার খোঁজার জন্য প্রথমে অল্প কিছু মৌমাছি চারিদিকে উড়ে যায়। এবার ধরা যাক, মৌমাছি এমন একটা ফুল পেল যাতে অনেক পরাগরেণু আছে। কিন্তু শুধু নিজে জানলেই তো হবে না, অন্যদেরকেও জানাতে হবে। তাই, এই মৌমাছিটা চাকে ফিরে যায়, আর গিয়ে একটা অদ্ভুত নাচ নাচে, যাকে বলে Waggle Dance। এই নাচের থেকে অন্যান্য মৌমাছিরা জেনে যায় একদম ঠিক কোথায় সেই ফুলটা খুঁজে পাওয়া যাবে। কার্ল ফন ফ্রিশ নামে এক অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী গত শতকের চল্লিশের দশকে এটা আবিষ্কার করেন এবং এই জন্য ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু ফুলের অবস্থান বোঝানো তো সহজ ব্যাপার নয় মোটেই। চাক থেকে ফুলের অবস্থান বোঝানোর জন্য শুধু দূরত্ব বোঝালেই তো হবে না, চাকের কোন দিকে ফুলটা অবস্থিত, সেটাও তো জানা দরকার! অর্থাৎ, ফুলের অবস্থান একটা ভেক্টর রাশি। কিন্তু একটা নাচের মাধ্যমে মৌমাছি এই অবস্থান বোঝায় কি করে? ব্যাপারটা খুব মজাদার।

তোমরা জানো আলো হল এক ধরণের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গের একটা চুম্বকীয় ভাগ থাকে আর একটা বৈদ্যুতিক ভাগ থাকে এবং দুটিই হল ভেক্টর রাশি। সুতরাং তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ একটি ভেক্টর তরঙ্গ , যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা transverse wave।

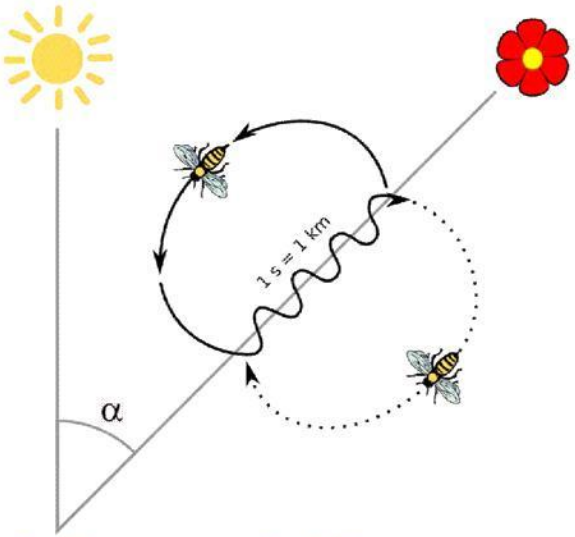

মৌমাছির নাচ : মৌমাছিটি বাংলার ৪-এর আকারের একটি পথে বারবার ঘুরতে থাকে। মাঝের অংশটাতে মৌমাছিটি শরীরের পিছনের অংশটা পর্যায়ক্রমে নাড়াতে থাকে। ওই মাঝের অংশটি যেদিকে নির্দেশ করে সেই দিকেই ফুলটা থাকে। ছবি : Emmanuel Boutet (Wikimedia)

যেহেতু এটা একটা ভেক্টর তরঙ্গ, তাই এর একটি দিকও থাকে, একে বলা হয় তরঙ্গটির পোলারাইজেশন। সাধারণত আলোক তরঙ্গের বৈদ্যুতিক ভাগের কম্পনের দিককেই পোলারাইজেশনের দিক হিসেবে ধরা হয়। সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে প্রবেশ করে তখন বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের আয়নগুলির প্রভাবে পোলারাইজড হয়ে যায় এবং এই পোলারাইজেশনের দিক সূর্যের দিকে হয়! মানুষের চোখ সেটা ধরতে পারে না কিন্তু মৌমাছির পুঞ্জাক্ষিতে তা ধরা পড়ে এবং আমরা যেভাবে ধ্রুবতারাকে দেখে দিক ঠিক করতে পারি সেইরকম মৌমাছিরাও সূর্যকে কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

এর পরের ব্যাপারটা কতকটা সহজ। ফুল খুঁজে পাওয়ার পর মৌমাছিটা চাকে ফিরে উপরের ছবির মত নাচ নাচে। পৃথিবীর অভিকর্ষ যেদিকে হয় ঠিক তার উল্টোদিককে ওরা সূর্যের দিক হিসেবে ধরে ; এইটা হলো ওদের দিকনির্ণয়ের মাপকাঠি। এরপর, মৌমাছিটি বাংলার ৪-এর মতো একটা পথে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে আর মাঝের অংশটায় শরীরের পিছনের দিকটা নাড়াতে থাকে (উপরের ছবির মতো, একেই বলে waggle dance)। আশে-পাশে যে সমস্ত মৌমাছিগুলো থাকে ওরা ওই মাঝের অংশটা লক্ষ্য করে। এই মাঝের অংশটা যেদিকে নির্দেশ করে ওটাই ফুলের দিক। কিন্তু শুধু দিক বললেই তো হবে না, দূরত্বও তো জানাতে হবে। এটাও ওই নাচের মাধ্যমেই বোঝাতে পারে। মৌমাছিটি মাঝের অংশের নাচটা যত বেশিক্ষণ ধরে নাচে, ফুলটাও তত বেশি দূরে পওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, এক সেকন্ড ধরে নাচলে ফুলটা মোটামুটি এক কিলোমিটার দূরে থাকে। মজার ব্যাপার হলো মৌমাছিদের দূরত্বের কোনো ধারণাই নেই, আছে শুধু সময়ের জ্ঞান। বেশিরভাগ প্রাণীর ক্ষেত্রেই সেটা সত্যি, এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও! ভেবে দেখো, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, "ভাই অমুকের বাড়িটা কোথায় রে?" আমরা কিন্তু বলিনা যে, "ওই ৫০০ মিটার হবে।" বরং আমরা বলি, "বেশি না, এই দশ মিনিটের হাঁটা পথ।" উল্টোদিক থেকে খুব জোরে হাওয়া দিলে, মৌমাছির কোনো ফুলে পৌঁছাতে অনেক বেশি সময় লাগে। তাই যখন হাওয়া দেয়, একই দূরত্বের জন্য মাঝের অংশের নাচটা মৌমাছিরা অনেক বেশি সময় ধরে নাচে। তাই, অন্য মৌমাছিদেরও ফুলে পৌঁছাতে কোনো ভুল হয় না। অবাক করার মত ব্যাপার! তাই না ?

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2014/10/26/honeybee_waggle_dance/
(লেখাটি ২৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

ধাঁধা - গলিগনের খোঁজ

দেবায়ন সেন
এম. এস. সি. (গণিত), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

লি স্যালস (Lee C. F. Sallows), পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু রিক্রিয়েশনাল ম্যাথামেটিক্স বা খেলাচ্ছলে গণিতে তার অবদানের জন্য বিখ্যাত। পলিগন বা বহুভুজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটা খুব সুন্দর পলিগন পেয়েছিলেন। তার ৮ টি বাহুর দৈর্ঘ্য ১, ২, ..,৮ এইরকম ও প্রতিটি কোণের মান ৯০ ডিগ্রি করে।

এই ধরনের বহুভুজদের নাম দেওয়া হলো গলিগন বা ক্রমিক আইসোগন। একটি বহুভুজ যার সমস্ত কোণ গুলি সমকোণ আর বাহু গুলি ক্রমিক পূর্নসংখ্যা (integer)।

এই অবদি বলে একটা ধাঁধা ছাড়ি। গলিগনের মজাটা বোঝা যাবে।

ধরুন, আমাদের প্রফেসর ক্যালকুলাস পেন্ডুলাম দোলাতে দোলাতে পায়চারি করছেন একটা নির্দিষ্ট নিয়মে। প্রথমে এক পা আগে। তারপর এর ঠিক ডান বা বাঁয়ে ঘুরে দু পা। তারপর আবার ডান বা বাঁয়ে ঘুরে তিন পা, এইভাবে চলছে। অর্থাৎ প্রতিবারই তার পথ আগের পথের সাথে সমকোণে থাকবে। আর পথ গুলি হবে ১ একক, ২ একক, ৩ একক - এইরকম। এখন প্রশ্নটা হল: প্রফেসর ক্যালকুলাস কি আবার সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে পারবেন যেটা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন?
ভেবে দেখুন দেখি! গুগল করবেন না যেন!

ভেবে বার করতে পারলে তারপর উত্তরটা মেলাতে ৩৭ -এর পাতা দেখুন

লি স্যালস-এর ছবি: উইকিপিডিয়া

দেড় দশকের বিজ্ঞান বলা

মানস প্রতিম দাস
আকাশবাণী কলকাতা

আমার বাড়ির উল্টো দিকে যে মুরগীর মাংসের দোকান আছে তার মালিক কখনই মনে করেন না যে আমি কোনো কাজের কাজ করি। এমন অনেকবার হয়েছে যে অফিস থেকে ফেরার পথে তার কটু মন্তব্য এসেছে আমার কানে - কী সব বিজ্ঞান-বিজ্ঞান যে করে এই ছেলেটা!

কী হয় এসব করে? বলা বাহুল্য, আমি কোনো তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইনি তার সঙ্গে। এলাকার যে স্কুলে পড়েছি আমি, তার ভূগোলের শিক্ষকও কোনো দিন মনে করেননি যে আমার কাজের কোনো মূল্য আছে! চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগে যত বার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, তিনি অবজ্ঞাই প্রকাশ করেছেন। পাড়ায় নাট্য অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক বলে পরিচিত যে ছেলেটা, নিজের দাবিতে যে সব সময় প্রগতিশীল, নাটক ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে দু'কথা শোনার বা পড়ার আগ্রহ নেই যার – তারও মনোভাব একই রকম। কী হয় এসব করে? নাটুকে ছোকরার কলকাতাবাসী গুরু বা অন্যান্য নাট্যবেত্তারা সুযোগ পেলেই বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতির জয়গাণ করেন। কিন্তু তাঁদের আচরণ দেখে এ ছোকরা শিখে গেছে যে বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগ না দিয়েই বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া যায়! তাই সে অনায়াসে বলতে পারে, "বিজ্ঞান-টিজ্ঞান কঠিন ব্যাপার, ও কি আর বেশি লোক শোনে নাকি?"

এর সঙ্গে রয়েছে মাধ্যমের প্রতি অবহেলা। এ কথা কে না জানে যে টেলিভিশন আসার পর রেডিও-র কদর গেছে কমে। সেটা যে শুধু এদেশে ঘটেছে তা নয়, ঘটেছে সর্বত্র। এর সঙ্গে আকাশবাণীর কারিগরী বিভাগের দুর্বলতা রেডিও শোনার ব্যাপারটাকে প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি এফ.এম. সম্প্রচার এসে অবস্থার সামাল দিল কিছুটা। ঝকঝকে

সম্প্রচার শুনে মানুষ নিজে থেকেই আলাদা করে নিল দুটোকে – "রেডিও তো এখন আর কেউ শোনে না, এফ.এম.-টাই শোনে!" দুটোই যে বেতার যন্ত্রের উপহার সেটা কে বোঝাবে? আগেকার মিডিয়াম ওয়েভ সম্প্রচারের সঙ্গে জুড়েছে এফ.এম., পার্থক্য এইটুকুই। আমি যখন রেডিওর চাকরিতে ঢুকি তখনও এফ.এম. আসেনি, ছিল কেবল অবাঞ্ছিত আওয়াজের ভারে নুয়ে পড়া মিডিয়াম ওয়েভ বা এ.এম.। ফলে সেই অবস্থায় আমাদের আত্মীয়রাও মন্তব্য করতে ছাড়ত না – " আমার রেডিও সেটটা তো খারাপ হয়েই আছে কত দিন। মহালয়ার আগে একবার সারিয়ে নেবো। তা ছাড়া তো দরকার হয় না।" আমার সহপাঠী, পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র অধ্যাপক আনন্দ দাশগুপ্ত আমার চাকরির কথা শুনে তড়িঘড়ি অভিমত দিয়েছিলেন – "ওখানে জয়েন করেছিস? ওই যেসব প্রোগ্রাম কেউ শোনে না, তার দায়িত্বে?" আমাদের আলোকবিজ্ঞান পড়াতেন যে অধ্যাপক, যাঁর মতে জীবনের একমাত্র পরিণতি রিসার্চ স্কলার হওয়া বা লেকচারার হওয়া, তিনি শুনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

এই চরম বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই পথ চলা শুরু আমার। বেতারে বিজ্ঞান প্রচারের পথ। সেখানে প্রথম পাঁচ বছর কেবল মিডিয়াম ওয়েভের জন্য অনুষ্ঠান করেছি। তারপর এলাম আমাদের অধিকর্তা ডক্টর অমিত চক্রবর্ত্তী-র সংস্পর্শে। ততদিনে এফ.এম. তরঙ্গ ভাসতে শুরু করেছে। সেখানে খ্যাতিমান শিল্পীদের উচ্চারণ শোনা যায়, তাঁদের কন্ঠে নাটক, আবৃত্তি, গান ভরিয়ে রাখে সময়। বাংলার পাশে হিন্দী গানও থাকত। জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে কয়েকটি বানিজ্যিক সংস্থাও সময় কিনে গান বাজাত এফ.এম.-এ।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সম্প্রচারের একমাত্র শর্ত ছিল বিনোদন। সেখানেই বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান অল্প অল্প করে শুরু করার পরামর্শ দিলেন অমিতদা। শুরুও করলাম, বিকেলের অনুষ্ঠানে। নেহাত অধিকর্তা বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষ, না হলে এফ.এম. প্রচারতরঙ্গে বিজ্ঞান বলার সুযোগ আকাশবাণী দিত কিনা তা নিয়ে আজও যথেষ্ট

"আমার চিরদিনের বিশ্বাস বিজ্ঞানের নিজস্ব একটা রস আছে যা দিয়ে মানুষকে মজানো যায়। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে উরু চাপড়ে আড্ডা দেওয়া যায় বিজ্ঞান নিয়ে। যেমনভাবে উত্তমকুমার বা অমিতাভ বচ্চন নিয়ে মাতোয়ারা হওয়া যায় আলোচনায় তেমনি বুঁদ হওয়া যায় বিজ্ঞানের খুঁটিনাটিতে।"

সন্দেহ আছে আমার। প্রথম দু'কয়েকটা অনুষ্ঠান কিন্তু ভালো হল না। শ্রোতাদের কেমন লেগেছিলো জানি না, আমি তৃপ্ত হতে পারিনি। এভাবেই টুকটাক অনুষ্ঠান করে শক্ত করলাম নিজের জমি। তারপর ১৯৯৯ সাল থেকে একেবারে ধারাবাহিক ভাবে শুরু করলাম আমার অনুষ্ঠান "রসিকের দরবারে "। পাক্ষিক অনুষ্ঠান, নামকরণ নিয়ে ভেবেছি অনেকদিন। প্রেম-ভালোবাসা-ভ্যালেন্টাইন-বিরহ জাতীয় রস যে আমার অনুষ্ঠানে থাকবে না সে তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমার চিরদিনের বিশ্বাস বিজ্ঞানের নিজস্ব একটা রস আছে যা দিয়ে মানুষকে মজানো যায়। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে উরু চাপড়ে আড্ডা দেওয়া যায় বিজ্ঞান নিয়ে। যেমনভাবে উত্তমকুমার বা অমিতাভ বচ্চন নিয়ে মাতোয়ারা হওয়া যায় আলোচনায় তেমনি বুঁদ হওয়া যায় বিজ্ঞানের খুঁটিনাটিতে।

কোথা থেকে এলো বিশ্বাসটা? অবশ্যই ইতিহাস থেকে। সে ইতিহাসে কার্ল সাগান যেমন আছেন তেমনি আছেন বরাহমিহির। বাঙালির রক্তে এই আড্ডা রয়েছে। তার মূলে কেবল রেনেসাঁ কিনা তা বলতে পারব না। আমার বিশ্বাস আর উৎসাহের আর একজন উৎস ছিলেন আমার বাবা। এফ.এম.-এ প্রথম অনুষ্ঠান করার আগেই অবশ্য বাবা প্রয়াত হন। আমার জন্য রেখে গেলেন ... না তেমন কোনো শিক্ষা নয়, বাবা শিক্ষাবিদ ছিলেন না। রেখে গেলেন একটা স্পিরিট, এই স্পিরিটের বাংলা কী হবে? যাই হোক্, সে স্পিরিটের মূল কথা নির্ভীকভাবে যে কোনো বিষয়কে ভেঙে, টুকরো করে বুঝতে চাওয়া। বিষয়টা যেমন বিজ্ঞানের হতে পারে তেমনি হতে পারে রাজনীতি- অর্থনীতির। বাবা বলতেন, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের কথকের শৈলী অনুকরণীয়। কীভাবে একদল মানুষকে মোহিত করে রাখতে পারেন তিনি। এটা অন্য প্রসঙ্গ যে তার কথা বলার বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম। নিজে নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন বলেই কিনা জানি না, কথোপকথন এবং বাচনভঙ্গী নিয়ে ভাবার চেষ্টা করতেন নিবিড়ভাবে। কিছু উত্তরাধিকার তো আমার মধ্যে বর্তাবেই!

প্রথম দিন থেকেই যে " বিজ্ঞান রসিকের দরবারে " হিট্ তা বললে মিথ্যে বলা হবে। রেকর্ড করা বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান শুনেছেন প্রবীণ শ্রোতারা, আকাশবাণীর বিজ্ঞান সম্প্রচার নিয়ে তাও কিছুটা জানেন এঁরা। নবীন প্রজন্মের কাছে মিডিয়াম ওয়েভের কোনো অস্তিত্ব-ই নেই। তারা এফ.এম. মানে বোঝে "মস্তি"। সেখানে বিজ্ঞান পরিবেশনার জন্য কিছু পরিচিত কৌশল নেওয়া হল। কুইজ ব্যাপারটা জনপ্রিয় এমনিতেই, তাতে আমার কিছুটা দক্ষতাও আছে। প্রথমে ক্যুইজ দিয়ে চেষ্টা হল তথ্য পরিবেশনের। বিজ্ঞানীদের জীবন সরসভাবে পরিবেশন করতে পারলে মানুষ আকৃষ্ট হয়। সেলিম আলি থেকে মেরি ক্যুরি – আলোচিত হল অনেকের কথাই। সঙ্গে রইল বিতর্ক। বিশেষ করে কুসংস্কার নিয়ে। সাধারণভাবে বিজ্ঞান কর্মীরা কোনো একটা কুসংস্কারকে তুলে ধরে খুব গালমন্দ করেন। তাঁদের ধারণা এতেই মানুষ কুসংস্কার ত্যাগ করবে। ভুল! মানুষের নিজের মনে কুসংস্কারের সপক্ষে কিছু যুক্তি জমা থাকে। তাকে সেগুলো বলার সুযোগ দিলে বেরিয়ে আসে যুক্তিগুলো, তখন ধীরে-ধীরে সেগুলোকে কাটা যায়, সামান্য হলেও তার মনে সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়। এটুকুই বিজ্ঞান প্রচারের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি। একবার সহ-উপস্থাপক আর আমি ফেং শুইয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি রাখলাম। বিতর্ক জমাতে কিছুটা অভিনয়-ও করলাম। আমাদের ফোন-ইন সুবিধে আছে। শ্রোতারা এসে পক্ষে-বিপক্ষে যোগ দিলেন। তারপর একসময় বিতর্ক থামিয়ে ফেং শুইয়ের উৎপত্তি, চীনে তার কুৎসিত প্রভাব বর্ণনা করলাম। ফলে যারা দোটানায় ছিলেন তারা বুঝলেন ব্যাপারটা। এর একটা অভাবনীয় ফল দেখলাম পরের দিন। আমাদের এলাকার এক স্বাস্থ্যকর্মী দিদি এসে জানিয়ে গেলেন তিনি অনুষ্ঠানটা শুনেছেন এবং শোনার পর একটা কাজ করেছেন। ফেং শুই বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী যে স্ফটিক গোলক কিনেছিলেন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন! সত্যিই এক বড় সাফল্য! আমি ফোনে খ্যাতিমান জ্যোতিষীদের আহ্বান করে বিতর্কও করেছি, সেটাও 'হিট্'! তবে হ্যাঁ, তার আগে জ্যোতিষের খুঁটিনাটি পড়ে নিতে হয়েছে আমাকে।

এগুলো যখন চলছে তখন ভীরু কন্ঠে বিজ্ঞানীদের কাছে বলার চেষ্টা করেছি – কিছু একটা করছি। দুঃখের বিষয়, কলকাতার অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা এসব ব্যাপারে নিস্পৃহ। তবে জীববিজ্ঞানী প্রণবেশ সান্যাল খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন। একজন চিকিৎসক, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ দেবাশিষ বসু একবার নিজে উদ্যোগ নিয়ে একগোছা জেরক্স করা কাগজ দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের দপ্তরে। এই বৈপরীত্য দেখে তাক্ লেগে যেত। বিজ্ঞানীদের সরাসরি স্টুডিওতে উপস্থিত করতে গিয়েও কম অপমান সইতে হয় নি! একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক-প্রশাসক তো মুখের ওপর বলে দিলেন যে মাঝরাতে কয়েকজন নিদ্রাহারা, পাগলের সঙ্গে ফোন-আলাপ করতে তিনি আসবেন না। এটা মানি শ্রোতারা অনেক সময় অবান্তর কথা বলেন। আসলে তারা তো আর বিজ্ঞানী নন। একটা বড় অংশ রয়েছে যারা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, তারা চেষ্টা করে প্রাসঙ্গিক কথা বলতে। কিন্তু বাকিরা? অনেক সময় কৌতুক ব্যবহার করে, কখনো কিছুটা কড়া হয়ে এদের মনেবীণার তার "টিউন" করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভুললে চলবে না এরাও আমাদের শ্রোতা। বলা ভালো, লক্ষ্য এরাও!

কটু কথা বলার পরেও কেউ-কেউ এসেছেন স্টুডিওতে। ফিরেছেন মুগ্ধ হয়ে। আজও অনেক বিজ্ঞানীর ধারণাই নেই " বিজ্ঞান রসিকের দরবারে "-তে কত গভীর প্রশ্ন আসে ফোনের তার বেয়ে! কত ছাত্র-ছাত্রী যে স্রেফ এই অনুষ্ঠান শুনে বিজ্ঞানে আগ্রহ ফিরে পেয়েছে তার পুরো হিসেব নেই আমার কাছে।

> আজও অনেক বিজ্ঞানীর ধারণাই নেই "বিজ্ঞান রসিকের দরবারে"-তে কত গভীর প্রশ্ন আসে ফোনের তার বেয়ে!

এই অনুষ্ঠানকে পনেরো বছর ধরে চালানো বোধহয় সহজ কাজ ছিল না। আজও অনেকের ভাব এই রকম – তুমি কি বিজ্ঞানের সব কিছু জানো? আমার পাল্টা প্রশ্ন, কে জানে সবকিছু? আমার দেড় দশকের প্রয়াস ছিল এই লাইভ অনুষ্ঠানকে বিজ্ঞান আলোচনার একটা প্ল্যাটফর্মে পরিণত করার। তার সূচনার দয়িত্ব নিতে হয়েছে নিজেকে। ইন্টারনেট্ অধ্যয়নের দিগন্ত প্রসারিত করে দেওয়ায় সুবিধে হয়েছে অনেক। তবে অনুষ্ঠানের সাফল্যের মূলে শেষ কথা অবশ্যই বাচনভঙ্গী। আড্ডার ছলে কঠিন কথাকে সহজ করে ফেলা। আমাদের পাড়ায় বিয়ে হয়ে আসা এক ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী-কে বলেছিলেন, "অনুষ্ঠান শুনতে-শুনতে মনে হয়, এভাবে পড়ালে আমিও বিজ্ঞান পড়তাম। আমিও ভালো রেজাল্ট করতে পারতাম।" পুরস্কার হিসবে মন্দ নয় মন্তব্যটা, কী বলেন ?

ডঃ মানস প্রতিম দাস,
অনুষ্ঠান কার্যনির্বাহক, আকাশবাণী কলকাতা,
আকাশবাণী ভবন

মানস প্রতিম দাস যেমন আকাশবাণীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে একজন সফল মানুষ তেমনই তাঁর নানান লেখা এবং তথ্যমূলক প্রযোজনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে!

লেখাটি বিজ্ঞান সাইটে (http://bigyan.org.in/) প্রকাশিত হয় ৭ মার্চ ২০১৪।

ছবি: Palosirkka(Wikimedia)

প্রথম চাষীর দল - পাতা কাটা পিঁপড়ে

অনিন্দিতা ভদ্র

আই. আই. এস. ই. আর., কলকাতা

মানব সভ্যতার ইতিহাস বলে যে আমাদের আদি প্রজন্মের মানুষ ছিল যাযাবর। তারা ঘুরে ঘুরে শিকার করে, গাছের ফলমূল সংগ্রহ করে খিদে মেটাতো, আর তাই খাবারের খোঁজেই যাযাবরের জীবন কাটাতে হত তাদের। তারপর একসময় মানুষ আবিষ্কার করল যে তারা চাইলে কিছু বীজ রোপণ করে গাছ তৈরী করতে পারে, আর সেই গাছ দিতে পারে শস্য, ফল। চাষের জন্ম হল। মানুষ ঘর বাঁধতে শিখল। গড়ে উঠতে শুরু করল সমাজ, সভ্যতা। ভয় নেই, মানব সভ্যতার চেনা ইতিহাস নিয়ে গল্প করতে আমি বসিনি। আমি বলব আর এক সভ্যতার কথা। সভ্যতা বলাটা ঠিক হলনা অবশ্য, পিঁপড়েদের সমাজ আছে, সভ্যতা নেই -তাই বলা উচিত সমাজব্যবস্থা। কিন্তু পিঁপড়েদের গল্পে মানুষ ঢুকে পড়ল কেন? কারণটা শুনতে সহজ, হজম করতে যদিও একটু কঠিন হতে পারে - আমি যাদের গল্প বলব, তারা চাষী পিঁপড়ে।

পিঁপড়েরা যে দল বেঁধে থাকে, মাটির নীচের বা গাছের খোঁদলের বাসায়, সে কথা অনেকেরই জানা। আবার তাদের বাসার বেশীর ভাগ অধিবাসীই যে শ্রমিক, আর মোটে একজন (বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্প কয়েকজন) রাণী, তা অনেকেরই অজানা নয়। এই শ্রমিক পিঁপড়েরা বাসা বানায়, সেই বাসা পরিস্কার রাখে, মেরামত করে, খাবার আনে, রাণী আর তার ছানাপোনাদের খাওয়ায়, বাসা পাহারা দেয়। এমনকি দরকার পড়লে বাসাবদল-ও করে, আর তখন নতুন বাসার জন্য সুবিধেজনক জায়গা খোঁজা থেকে শুরু করে বাসা তৈরী করে রাণীর হাজার হাজার কুঁচোকাঁচাকে ঘাড়ে করে বয়ে নতুন বাসায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছু করতে হয় তাদেরই। এককথায়, জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ আর কি! এই সব ব্যস্তবাগীশ শ্রমিকদের সাথে প্রায়ই দেখা হয়ে যায় আমাদের, ঘরের দেওয়ালে, রান্নাঘরের তাকে, ঝুড়ি-চাপা মিষ্টির গায়ে, মেঝেতে, রাস্তায়, মাঠে,

গাছের ডালে, ফুলের ভেতরে, কোথায় নয়? মাঝে মাঝেই বেচারারা মারাও পড়ে আমাদের হাতে। অনেক লোক আমি এমনও দেখেছি, যাদের পিঁপড়ে দেখলেই মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে। হয়ত কিছু একটা আদিম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে এদের ভেতরে। সেই যখন মানুষ চাষবাস শেখেনি, সেই সময় কোনো ছোটোখাটো জীব দেখলেই হয়ত মেরে খাওয়ার জন্য মন আনচান করে উঠত, তেমন কোনো হাত-নিশপিষ করা ইচ্ছে।

কিন্তু এমনও অনেক মানুষ আছে যাদের পিঁপড়েদের দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, জানতে ইচ্ছে করে এরা কেন সারাদিন এরকম ছুটে বেড়ায়, কিসের এত ব্যস্ততা এদের, কিসের জন্য এত কাজ করা? অনেক বৈজ্ঞানিক এই ধরণের নানান প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন নানান প্রজাতির পিঁপড়েদের নিয়ে গবেষণা করে। সেই সব গবেষণার বিশদ বিবরণ না দিয়ে, আমি আজ এক ধরণের পিঁপড়ে নিয়ে গল্প করব। এদের সাধারণ ভাষায় বলা হয় লিফ কাটার অ্যান্টস বা পাতা কাটা পিঁপড়ে। মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকার দুই প্রজাতি মিলিয়ে ৩৯টি স্পিসিস বা উপজাতির পিঁপড়েকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে সব থেকে পরিচিত নাম হল Atta sexdens। সেই Atta-কে ধরেই তাহলে গল্পটা চলুক।

পানামার জঙ্গলে বেড়াতে গেলে একটা মজাদার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে সহজেই। সারি দিয়ে পাতার টুকরো হেঁটে চলেছে গাছের ডালের ওপর, নেমে যাচ্ছে মাটিতে, ঢুকে যাচ্ছে মাটির ঢিবির মধ্যে। একটু কাছে গিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে প্রতিটা পাতার টুকরোকে আসলে ঘাড়ে করে বয়ে যাচ্ছে এক একজন পিঁপড়ে। Atta sexdens-এর বাসার বাইরে পাহারা দেয় সৈনিক পিপড়েরা। এরা সবচেয়ে বড় মাপের শ্রমিক, আর তেমনই বড় আর শক্ত এদের চোয়াল। বাসার আশেপাশে কাউকে হানা দিতে দেখলেই সেই চোয়ালের কামড়ে তাকে ঘায়েল করে দেয় যৌথভাবে। পাতা কেটে আনা আর মাটির নীচে গর্ত করার কাজ যাদের, তারা হল খাদ্যসন্ধানকারী-খননকারী পিপড়ে। এরা যোদ্ধাদের থেকে আকারে কিছুটা ছোট, কিন্তু এদের চোয়ালেও বেশ জোর, নাহলে মোটা, শক্ত পাতা কাটবে কি করে, আর মাটিই বা খুঁড়বে কি করে। মাটির তলায় ঢোকার আগে একবার বাসার বাইরেটা দেখে নেওয়া যাক।

জঙ্গলের মাঝখানে একটা বড়সড় ফাঁকা জায়গায় একটা মাটির ঢিবি। তার মাথার ওপর অনেকগুলো চূড়া ধরণের মুখ, অনেকটাই বাচ্চাদের তৈরী বালির দূর্গের চূড়ার মতো। এই অদ্ভূত গঠনের দুরকম উপযোগীতা: এক, বৃষ্টি হলে বেশী জল বাসার ভেতরে ঢুকতে পারবে না, কারণ ফুটোগুলো ছোট, আর দুই, বাসার ভেতরে বেশী গরম হয়ে গেলে মাঝের অপেক্ষাকৃত বড় মুখ দিয়ে গরম হাওয়া বেরিয়ে যাবে, আর পাশের ছোট ছোট মুখগুলো দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে আসবে - প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম! মাটির নীচে রয়েছে এদের বিস্তৃত বাসা। ছোট-বড় মিলিয়ে হাজার দুয়েক খোপ - ছোটগুলো চাষের ঘর, আর বাসার বাইরের দিকের বড় খোপগুলো ময়লা ফেলার জায়গা। এই চাষের ঘরগুলোর মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয় পাতার সার। সেই সার তৈরী করার কাজ আর একদল শ্রমিকের। এরা আরো ছোট, বাসার বাইরে যায় না এরা কোনদিন। পাতা বয়ে আনার পর খাদ্যসন্ধানকারীদের কাজ শেষ।

এবারে এই বাসার ভেতরে থাকা ইন্ট্রানিডাল (intranidal) স্পেশালিস্টরা চাষের কাজে লেগে যায় সেই পাতা নিয়ে। পাতার টুকরো চিবিয়ে মন্ড

করে তার সাথে মেশে পিঁপড়ের মল, অনেকটা যেমন আমরা গাছের গোড়ায় গোবর দিই তেমন। তারপর সেই সারের মধ্যে পুঁতে দেয় এক টুকরো ফাংগাস (fungus)। না, যে কোনো ফাংগাস হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে একটা বিশেষ প্রজাতির। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে সব প্রজাতির চাষী পিঁপড়েই Leucocoprinus gongylophorus এর চাষ করে। ঠিক কোন প্রজাতির ফাংগাস তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এক বাসায় যে কখনো একাধিক রকমের ফাংগাস পাওয়া যায় না তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সবথেকে ছোট মাপের যে শ্রমিক, তারা হল নার্স-কাম-মালি। এদের কাজ রাণী আর তার কাচ্চাবাচ্চাদের খাওয়ানো, আর ফাংগাসদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রোপণ করা। তাছাড়া, মালি যেমন শুধু বীজ রোপণ করেই ক্ষান্ত হয় না, তার চারা গাছের আশেপাশে গজিয়ে ওঠা আগাছাদের উপড়ে ফেলে দিয়ে চারাদের বাড়তে সাহায্য করে, এই মালি পিঁপড়েরাও তেমন আগাছা ফাংগাস দেখলেই সেগুলো উপড়ে ফেলে দিয়ে তাদের সাধের প্রজাতিটিকে ভেজালহীন অবস্থায় লালন করে। এদের এই নিখুঁত মনোকালচার অনেক বৈজ্ঞানিককেই হিংসায় ফেলবে, কারণ ব্যাকটেরিয়া বা ফাংগাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কোনো না কোনো 'আগাছা'-র অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি এমন মাইক্রোবায়োলজিস্ট বিরল।

এখানেই শেষ নয়। যাতে তাদের এই যত্নে লালন করা বাগানের ক্ষতি না হয়, তাই এই পিঁপড়েরা দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করে একে অপরকে পরিস্কার করতে। রাণীকে পরিস্কার করে দিয়ে বাসা থেকে যতটা সম্ভব ময়লা সরিয়ে ফেলে। গায়ের ময়লা পরিস্কার করে তারা জমিয়ে রাখে মুখের ভেতরে একটা থলেতে। ময়লা ফেলার ঘরগুলো বাসার বাইরের দিকে, সেখানে জমা করা হয় মৃতদের, যত এঁটোকাঁটা, চাষের ঘরের আবর্জনা, আর ওই মুখের ভেতরে জমে থাকা ধুলো-মাটির দানা। ওই ময়লা ফেলার ঘরে জমে থাকা সবকিছু আস্তে আস্তে মিশে যায় মাটির সাথে। পিঁপড়েদের কাজে না লাগলেও, এর থেকে লাভ হয় আশেপাশের গাছেদের। চাষী-পিঁপড়েদের বাসার ময়লা ফেলার ঘরে হানা দেয় গাছের শেকড়, শুষে নেই পুষ্টির উপাদান। প্রকৃতির চাকা ঘুরে চলে।

কিন্তু এত আয়োজন কি শুধুই শখের বাগান সাজাতে? অবশ্যই নয়। পিঁপড়েদের সাথে ফাংগাসদের এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে আর সেই বন্ধুত্ব দিনে দিনে এমন প্রখর হয়ে উঠেছে যে একজনকে ছাড়া অন্যজনের বাঁচাই দায়। চাষী পিঁপড়েরা এভাবে সযত্নে পুষে রাখে বলেই এই ফাংগাসরা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থাকে। এক একটা Atta-র বাসার আয়ু তার রাণীর আয়ুর সমান, মানে বছর কুড়ি। এই কুড়ি বছরে এইসব বাসা মাটির নীচে ৫০-৮০ লক্ষ শ্রমিক নিয়ে এক একটা রাজত্ব হয়ে ওঠে। আর এই শ্রমিকরা, তাদের রাণী আর তার কাচ্চাবাচ্চারা, সবার খাবারের ভাণ্ডার এই ফাংগাসের গায়ে তৈরী হওয়া gongylidium। এই প্রজাতির ফাংগাসদের শরীরের এই বিশেষ অংশটি এদের নিজেদের কোনো কাজেই লাগে না, এর একটাই কাজ - পিঁপড়েদের খাদ্য হওয়া! নার্সরা ফাংগাসের ছোট ছোট টুকরো কেটে দেয় বাসার বাকিদের খাওয়ার জন্য, আর সেই টুকরো নিয়ে নিজেরা খাওয়ায় রাণী আর তার বাচ্চাদের। এই ফাংগাস না পেলে Atta বা তাদের মতো অন্য পিঁপড়েরা বাঁচবে না, আর তাই প্রিয় খাবারের অভাব না ঘটতে দেওয়ার জন্য চাষ করে এরা, আদিম মানুষ বা অন্যান্য পিঁপড়েদের মতো খাবারের খোঁজে ছুটে না বেড়িয়ে। প্রথম মানুষের জন্মের বেশ কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই এই ক্ষুদে চাষীরা সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে মাটির নীচে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন তার খবর রাখে?

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2014/10/10/leaf_cutter_ants/
(লেখাটি ১০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

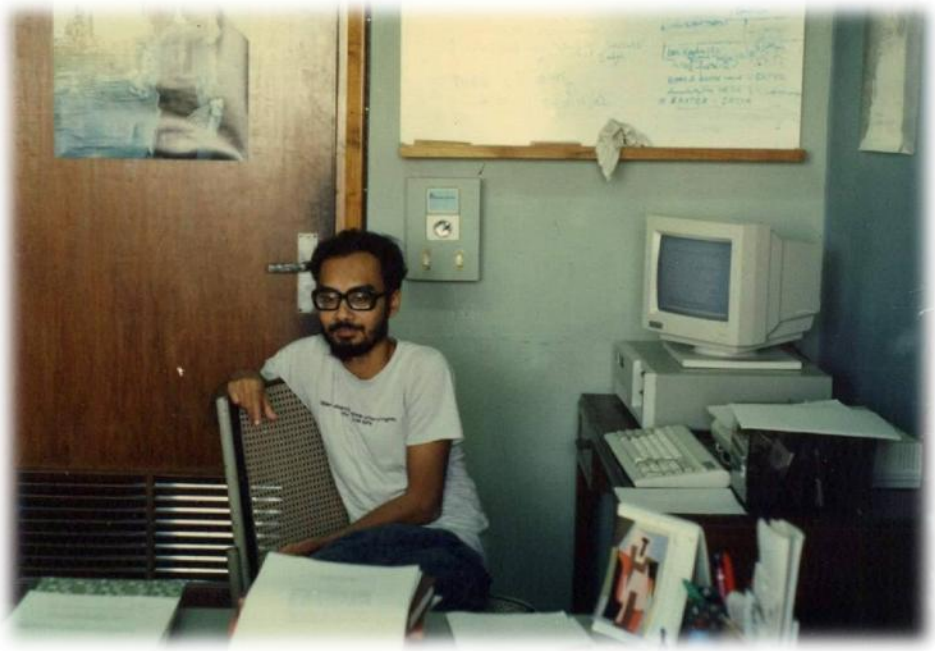

ডিরাক মেডেলে সম্মানিত বিজ্ঞানী অশোক সেন

পল্লব বসু

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল সায়েন্সেস, বেঙ্গালুরু

এলাহাবাদনিবাসী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অশোক সেনের নাম আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন। সাম্প্রতিক তিনি সম্মানিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিরাক মেডেলে (২০১৪)। আগে পেয়েছিলেন Fundamental prize (২০১২) এবং ICTP prize (১৯৮৯)। এছাড়াও সেন বহু দেশী, বিদেশী পুরস্কারে ভুষিত হয়েছেন। ভারত সরকার তাঁকে দিয়েছেন পদ্মভূষণ। ডঃ সেন একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, তাঁর গবেষণার বিষয় হল string theory (তন্তুতত্ত্ব) এবং black hole (কৃষ্ণগহ্বর)। কি দিয়ে সমস্ত কিছু গড়া - মহাবিশ্বের গুঢ় থেকে গুঢ়তম রহস্যভেদের নিরলস সাধনে মগ্ন এই বিজ্ঞানী। গর্বের কথা হল, বহু বিদ্যমান বিজ্ঞানী ভারতে কাজ করেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু সেনের ব্যাপারটা ভিন্ন, তিনি শুধুমাত্র খ্যাতি লাভ করেন নি - তিনি বারংবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গিয়েছেন, সন্ধান দিয়েছেন নতুন নতুন দিশার, হয়েছেন তামাম বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজের পথপ্রদর্শক। এই কারণে, ডঃ সেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ হাতেগোনা কয়েক জন তন্তুতাত্ত্বিকের মধ্যে বিবেচিত হন।

কেবলমাত্র একটা তত্ত্ব দিয়ে কি মহাবিশ্বের খুদ্র থেকে বৃহৎ সর্বরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব? কি সেই মহাতত্ত্ব? - তন্তুতত্ত্ব এ ব্যাপারে এক প্রধান

দাবীদার। অণুর ভিতর থাকে পরমাণু। পরমাণুর ভিতরে আছে বিভিন্ন মৌলিক কণা - ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন আর মেসন। তন্তুতত্ত্ব-র বক্তব্য হল এইসব মৌলিক কণা ছোটছোট তন্তু দিয়ে তৈরী: রাবারব্যান্ডের মত। সেতারের তারের বিভিন্ন কম্পন থেকে যেমন বিভিন্ন সুর হয়, তেমন তন্তুর কম্পন থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন মৌলকণা। মজার ব্যাপার হল, তন্তুর এই কম্পন থেকে পাওয়া যায় গ্র্যাভিটন। যা মহাকর্ষের বাহক। তন্তুতত্ত্ব ছাড়া অন্যান্য তত্ত্ব থেকে চট করে মহাকর্ষ বোঝা যায় না। মহাকর্ষ থাকলেই থাকবে রহস্যময় কৃষ্ণগহ্বর - স্থান কালের মধ্যে একটি গহ্বর যার থেকে আলো অব্দি বেরোতে পারেনা। সেন তন্তুতত্ত্বে কৃষ্ণগহ্বরের রহস্যভেদের এক অন্যতম পথিকৃৎ। তবে তন্তুতত্ত্ব একপ্রকার নয়, বিভিন্ন ধরণের তন্তুতত্ত্ব হয়। কিন্তু পরে বোঝা গেছে, ঐসব বিভিন্ন তত্ত্ব আসলে একটাই মহাতত্ত্বের বিভিন্ন রূপ। সেন ঐ ব্যাপারেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও তন্তুতত্ত্বের (এবং বিশিষত তন্তুক্ষেত্রতত্ত্বের) অন্যান্য বিষয়ে ডঃ সেনের বহু উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

ডঃ সেনের জন্ম ১৯৫৬ সালে, কলকাতায়। তিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে স্নাতক এবং আইআইটি কানপুর থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। আগে ছিলেন TIFR মুম্বাইতে। বর্তমানে তিনি HRI, এলাহাবাদে কর্মরত।

ছবিটি চারকোল মিডিয়ামে এঁকেছে সূর্যকান্ত শাসমল

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে সবই খাতাকলমে কাজ, সেনও তাই করেন। সদাহাস্যময়, সদাবিনয়ী, আড়ম্বরহীন এই মানুষটিকে দেখে বোঝার যো নেই যে তিনি কত বড়মাপের বিজ্ঞানী। গবেষনার বাইরে উপভোগ করেন ভ্রমণ। ভালবাসেন ইউরোপের শহর গুলি হেটে পরিভ্রমণ করতে। সেন ভোজনরসিক, আর লোকমুখে শুনেছি নিজেও অতীব রন্ধনপটু। বেশী পছন্দের মাছমাংস। কন্ফারেন্সে ডিনারে বলতে শুনেছি আমিষ আর সালাড ছাড়া আর কিছুই নেন নি।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2014/08/14/ashoke-sen-dirac-medal/
(লেখাটি ১৪ অগাস্ট ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত

প্রচ্ছদে অশোক সেনের ছবি: হরিশচন্দ্র গবেষণা কেন্দ্রের পূর্বে বিজ্ঞানী অশোক সেন মুম্বই-এর টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ বা TIFR-এ অধ্যাপনা করেছেন ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। সেই সময়কার একটি ছবি। সৌজন্যে: অধ্যাপক Sunil Mukhi এবং সুদীপ্ত মুখার্জী।

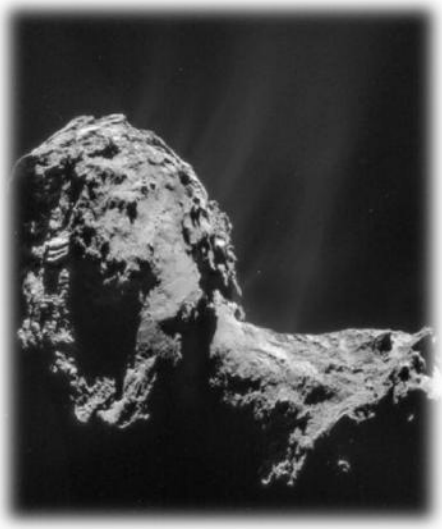

'ছবির উৎস - ইউরোপীয় সায়েন্স এজেন্সি'

ধূমকেতু চত্বরে

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ম্যাথওয়ার্কস, ম্যাসাচুসেটস

মহাকাশ অভিযানে একটা নতুন অধ্যায় জুড়ল গত বছর। পৃথিবী, বুধ, শুক্র, শনি, চাঁদ, গ্রহাণু – সব সেরে একটা ধূমকেতুর উপর কৃত্রিম উপগ্রহ বসালাম আমরা। ধূমকেতু 67P/Churyumov-Gerasimenko সেই উপগ্রহকে বগলদাবা করে এখন সূর্যের দিকে চলেছে। সাথে সাথে পটাপট ছবি আসছে গবেষণাগারে। আশা করা যাচ্ছে, ২০১৫-র ডিসেম্বরে যখন মিশন শেষ হবে, তার মধ্যে ধূমকেতু ঘিরে অনেক রহস্যের কিনারা করা যাবে। বিশেষত, পৃথিবীর আজকের ভূগোলের পিছনে কোনো ধূমকেতুর ভূমিকা আছে কিনা, সেই প্রশ্নের একটা হিল্লে হতে পারে।

ধূমকেতু বললেই মাথায় আসে আকাশে লেজুড়ওয়ালা একটা আলোর গোলা, লেজুড়টা ধোঁয়াটে। তীরবেগে আকাশ চিরে না জানি কোথায় চলেছে। অদ্ভুত তাদের কক্ষপথ। ক্ষণিকের জন্য তারা সূর্যের কাছে এসে পড়ে, তবে বেশিরভাগ সময়টাই তাদের কাটে সৌরজগতের দূর দূরন্তে। এখন মোটামুটি নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে ওই ধোঁয়াটে লেজুড়টা আসলে জলীয় বাষ্প। হ্যাঁ, বরফ গলে জল, জল থেকে বাষ্প, সেই বাষ্প।

বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন যে পৃথিবীর জলের উৎস হয়ত কোনো বহিরাগত ধূমকেতু। সৃষ্টির আদিম কালে, যখন পৃথিবী ছিল একটা জ্বলন্ত গোলা, জল তৈরী হলেও তা কবেই উবে যাওয়ার কথা। এখনকার থৈ থৈ জলের একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে বিজ্ঞানীরা তাই ধূমকেতুর দিকে তাকান। তবে এটা একটা থিওরি মাত্র। থিওরি প্রমাণ করতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। ধূমকেতু দেখাই যায়

কালেভদ্রে, তার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা কিসের? কিন্তু, এবার সেটা সম্ভব। ধূমকেতু 67P/Churyumov-Gerasimenko-র চারিদিকে এখন একটা চলমান ল্যাবরেটরি পাক খাচ্ছে। সে যেখানে যাবে, ল্যাবরেটরিটাও তার গলার মাদুলি হয়ে সাথে সাথে যাবে।

শুধু প্রযুক্তির দিক থেকেই এই অভিযানের সাফল্য একটা সাংঘাতিক কীর্তি। কেন, সেটা বুঝতে হলে ২০১৪-র ক্লাইম্যাক্সটুকু দেখলেই চলবে না। ২০০৪-এর মার্চ মাসে যখন Rosetta মহাকাশযানটিকে ছাড়া হয়েছিল, ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সীর বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর কক্ষপথ যেটা জানতেন, সেটা ১০০ কি.মি. এদিক ওদিক হতে পারে। ১০ বছর পর, এখন Rosetta ধূমকেতুর চারিদিকে গ্যাঁট হয়ে ঘুরছে। তার কক্ষপথের গড় ব্যাসার্ধই ১০০ কি.মি.-এর কম। সবচেয়ে কাছে যখন আসছে ধূমকেতুর, দূরত্বটা ২৯ কি.মি. মত। এই মাঝের ১০ বছরে অনেক ঝক্কি গেছে। মহাকাশে থাকাকালীন যানটির গতিপথ পরিবর্তন করতে হয়েছে। যত ধূমকেতুর কক্ষপথ সম্বন্ধে আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেছে, তত মহাকাশযানটির গতি বাড়ানোর প্রয়োজন হয়েছে।

একটা জনমানবহীন মহাকাশযানের গতি দুম করে বাড়ানো কমানো মুখের কথা নয়। রকেট ব্যবহার করাই যায়। মহাকাশযান থেকে রকেট ছাড়বে আর মোটরবাইকের কিক-স্টার্টের মত তাতে গতি বেড়ে যাবে। তবে তাতে জ্বালানি যা লাগে সেই জ্বালানি ঘাড়ে করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াও একটা সমস্যা। খরচসাপেক্ষ-ও বটে। সেটা এড়াতে, সেই সোভিয়েত স্বর্ণযুগ থেকেই, মহাকাশযান পরিচালনায় একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করা হয় মাঝেমাঝে। একে বলে gravity assist বা মাধ্যাকর্ষণের মদতদান। চট করে বললে, একটা মহাকাশযান যদি অধিবৃত্ত আকারের কক্ষে একটা গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের কবলে ঢোকে, আধপাক মত খেয়ে সেটা যখন বেরোবে, তার গতির মধ্যে গ্রহের গতির প্রায় দ্বিগুণ জুড়ে যাবে। শক্তি বা ভরবেগের সংরক্ষণ ভাঙ্গেনা এতে, কারণ গ্রহের ভরবেগ কিছু কমে যায়। শুধু দৈত্যের মত ভর বলে গতি এতটাই সামান্য কমে যে কেউ টের পায়না। এই পদ্ধতিতে বিনা জ্বালানি খরচে মহাকাশযানের গতি বাড়ানো যায়।

এই gravity assist সবসময় ব্যবহার করা যায় না, কারণ মহাকাশযানের জন্য যেমনটি চাই, সেরকম অবস্থায় কোনো গ্রহ থাকবে, এমন কেউ কথা দেয়নি। তবে Rosetta-র জন্য এই পদ্ধতিটি বারকয়েক ব্যবহার হয়েছিল। কখনো পৃথিবী, কখনো মঙ্গলগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছিল। মঙ্গলগ্রহের সময় Rosetta পড়ে গেছিল গ্রহের ছায়ায়। সোলার প্যানেল বেকার হয়ে গেছিল, তাই ব্যাটারীতে চলছিল মহাকাশযানটি। একবার কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়ার পর ব্যাটারী বাঁচাতে পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ মাঝখানে বিছিন্ন করা হয়েছিল। ভেবে দেখুন, বিজ্ঞানীদের বুক ধুকপুক অবস্থা!

যাক, সব ভালো যার শেষ ভালো। দশ বছর মহাকাশে চক্কর কেটে Rosetta তার গন্তব্যে পৌঁছেছে। পুরো যে প্ল্যানমাফিক গেছে, সেটাও বলা ঠিক না। Rosetta মিশনের আরও দুঃসাহসী প্ল্যান ছিল। 67P/Churyumov-Gerasimenko-র

উপর একটা ল্যান্ডার নামানোরও কথা ছিল। Philae নাম তার। উদ্দেশ্য ছিল - শুধু ছবি নয়, ধূমকেতুর উপর ড্রিল দিয়ে ফুটো করে তার নিচে কি আছে, সেই খোঁজ নেওয়া। যেহেতু ধূমকেতুর উপর অনর্গল গ্যাস নির্গত হচ্ছে, তাই ল্যান্ডারকে অক্ষত নামানোটাও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। ছ' সপ্তাহের খোঁজের পর একটা ল্যান্ডিং সাইট বাছা হয়েছিল, যেটা তুলনায় সুরক্ষিত। ১২ নভেম্বর Philae তার মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধূমকেতুর উপর নামা শুরু করলো। নামলো-ও সেই দিন-ই, কিন্তু গোল বাধলো নামার পরেই। ধূমকেতুর পিঠের উপর যাতে ল্যান্ডারটা আঁকড়ে বসতে পারে, তাই হারপুন, স্ক্রু সবের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কি কঠোর জমির উপর নামতে হবে, সেটা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।

ল্যান্ডারটা জমির উপর আছাড় খেয়ে শুন্যে উঠলো। এতোটাই যে আরেকটু উঠলে ধূমকেতুর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে বেরিয়ে আসতো। দ্বিতীয়বার নামার পর ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এমন এক খাঁজে এসে থামল, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না। তার ব্যাটারী-ও রিচার্জ করা গেল না, যোগাযোগ-ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের তবু আশা মরেনি। ধূমকেতু সূর্যের দিকে এগোচ্ছে। আশা করা হচ্ছে এমন এক সময় আসবে যখন সেই খাঁজটাও আলোকিত হয়ে উঠবে। ব্যাস, তড়াক করে জেগে উঠবে Philae। তবে আপাতত সেই যজ্ঞের ইতি।

তবে ওটা হলে বাড়তি পাওনা হত। মিশনটাকে মোটামুটি সফলই বলা চলে। ইতিমধ্যেই এই সাফল্যের কিছু সুফলও আসতে শুরু হয়েছে। মহাকাশযানের মধ্যে থাকা একটা mass spectrometer-এর সাহায্যে ধূমকেতু থেকে নির্গত বাষ্পে হাইড্রোজেন (H) আর তার ভারী জমজ ডিউটেরিয়াম (D), এই দুইয়ের অনুপাত খুব সুক্ষ্মভাবে মাপা গেছে। সেটা পৃথিবীতে মাপা D/H অনুপাতের থেকে তিন গুণেরও বেশি। এখনো অব্দি যে সব ধূমকেতুর D/H অনুপাত মাপা হয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা একটা সুন্দর গল্প সাজিয়েছিলেন। সেই গল্পটা ঘেঁটে গেছে এই নতুন তথ্য আসার ফলে। নতুন করে ভাবতে বসেছেন বিজ্ঞানীরা।

গল্পটা কি? তার আগে একটা ছোট্ট ভূমিকা। মহাকাশে আপাতত দুটো জায়গা আলাদা করা গেছে, যেখান থেকে ধূমকেতুর আমদানি হয়। সূর্য থেকে শুরু করে বাইরের দিকে বেরোলে প্রথম জায়গাটা আসবে নেপচুনের ঠিক পরে। যেহেতু বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ এদের কক্ষপথ নির্ণয় করে, এখান থেকে আসা ধূমকেতুগুলোকে বলে Jupiter family comets (JFC)। আর দ্বিতীয় ঘাঁটিটা সৌরজগতের একেবারে সীমানায়। একটা ঘন মেঘের মত জাপটে আছে সৌরজগতটাকে। এখান থেকে আসা ধূমকেতুগুলোকে বলে Oort cloud comets (OCC)। হ্যালির ধূমকেতুর কথা আমরা শুনেছি, সেটার Oort মেঘমুলুক থেকে জন্ম।

বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম বলতেন, সৌরজগতে D/H অনুপাত সূর্য থেকে যত দূরে যাওয়া হবে, তত বাড়বে। কিছু মডেল দেওয়া হয়েছিল তার। প্রথম প্রথম যে সব তথ্যগুলি পাওয়া গেছিল, সেগুলো কিছু OCC-র D/H অনুপাত মেপে। তাতে এই গল্পটা খাটছিল বেশ ভালো । সদ্য কিছু নতুন তথ্য

পাওয়া গেছে JFC-গুলোকে নিয়ে। তাদের D/H অনুপাত দেখা গেছে পৃথিবীর কাছাকাছি প্রায়। এর ফলে দুটো জিনিস হলো। এক, মডেল পালটাতে হলো, কারণ পৃথিবী থেকে নেপচুনের দূরত্ব বেশ খানিকটা। কাছাকাছি D/H অনুপাত হওয়া সম্ভব নয় পুরনো মডেল অনুযায়ী। দুই, পৃথিবীর জলের পিছনে কিছু JFC-র হাত আছে, এমন মনে করা হলো।

এইসব কিছুর মধ্যে এলো Rosetta-র মাপা D/H অনুপাত। ধূমকেতু 67P/Churyumov-Gerasimenko JFC পরিবারের সদস্য আর এই মাপটা আগের JFC গুলোর সাথে একেবারেই মেলে না। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন, সোজাসাপটা মডেল দিয়ে সব ধূমকেতুকে বোঝা যাবে না। আর পৃথিবীর জলের পিছনে ধূমকেতুর বদলে বা সাথে সাথে গ্রহাণু বা asteroid -এরও অবদান থাকতে পারে এমন মনে করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2015/01/15/rosetta-mission/
(লেখাটি ১৫ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

'ছবির উৎস - ইউরোপীয় সায়েন্স এজেন্সি'

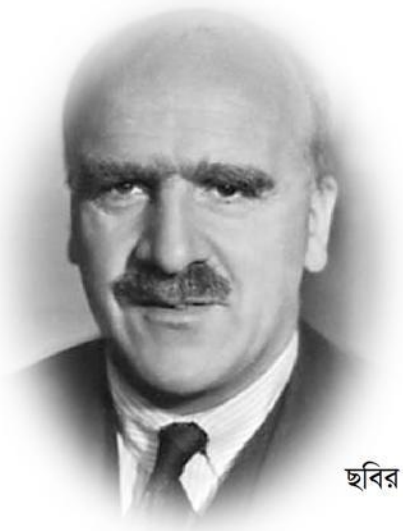

ছবির উৎস - এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

বিস্ময়ের নাম হ্যালডেন

মানস প্রতিম দাস

আকাশবাণী কলকাতা

জন বার্ডন স্যান্ডারসন হ্যালডেন এক অদ্ভূত প্রকৃতির মানুষ। এক সাধারণ কলমচির এটুকু বলে থেমে যাওয়াই নিরাপদ। কিন্তু থামলে যে নিবন্ধ হয় না! ওদিকে বিস্তার করতে গেলে পড়তে হয় অথৈ জলে। প্রায় বাহাত্তর বছরের জীবনে মানুষটা যে কত কিছু ভেবেছেন, বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বাস হারিয়েও ফেলেছেন, কাজ করেছেন, করিয়েছেন, লিখেছেন, ঝগড়া করেছেন, কত যে বন্ধু পাতিয়েছেন, আবার বন্ধুত্বের বিচ্ছেদও করেছেন তার পূর্ণ তালিকা করা অসম্ভব! তাঁর কোন জীবনটা যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ণয় করাও কঠিন। জীবনের শেষ তৃতীয়াংশে যেভাবে রাজনীতি আর বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর শ্রমসাধ্য চেষ্টা করেছেন তার জটিলতাকে ব্যাখ্যা করা একেবারেই সহজ কাজ নয়। তবু বারেবারে এমন মানুষকে আবিষ্কার করার একটা দায়িত্ব থেকেই যায় বিজ্ঞান লেখকদের কাঁধে। সেই দায়িত্ব পালনের এক অক্ষম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে এই লেখাকে।

হ্যালডেনের নীতি

হ্যালডেনের সঙ্গে পরিচয়ের সবথেকে মনোরম পথ তাঁর জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লেখাগুলো। যে কোনো একটা নেওয়া যাক। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় 'অন বিয়িং দ্য রাইট সাইজ'। পোকামাকড় থেকে শুরু করে মানুষ, লম্বা-গলা জিরাফ থেকে বেঁটে গন্ডারের আকৃতি যে বিজ্ঞানের কঠোর নিয়ম মেনে, এই কথাটা যে এত মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে যে বোঝানো যায়, তা এই লেখা না পড়লে বিশ্বাস করা মুশকিল।

এই লেখা থেকেই হ্যালডেনের বৈজ্ঞানিক প্রবণতা বোঝা যায়। সব কিছু মেপে দেখতে চান তিনি। ঠান্ডার দেশে কেন ছোট আকৃতির প্রাণীদের দেখতে পাওয়া যায় না, কিংবা মেরু অঞ্চলে কেন সরীসৃপ ও উভচর প্রায় মেলে না, তা বোঝাতে তিনি পরিসংখ্যান এনেছেন। পাঁচ হাজার ইঁদুরের ওজন একটা মানুষের ওজনের সমান। কিন্তু এদের চামড়ার মিলিত ক্ষেত্রফল একটা মানুষের ত্বকের ক্ষেত্রফলের সতেরো গুণ। এই ত্বকের মাধ্যমেই শরীরের তাপ বাইরে বেরিয়ে যায়। তাই উপযুক্ত তাপের জন্য ওই পাঁচ হাজার ইঁদুরকে একটা মানুষের তুলনায় সতেরোগুণ খাবার ও অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হয়। এতটা জিনিসপত্র শীতের দেশে পাওয়া যায় না। তাই সব মিলিয়ে বেশি ক্ষেত্রফল যুক্ত ত্বকের প্রাণীরা সেখানে নেই। ভাবনাটা একদম মৌলিক, তাই সমকালীন কিছু বিজ্ঞানীরা একে 'হ্যালডেনের নীতি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

এই নীতিতেই এগিয়ে রচনার শেষে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কত মানুষ থাকতে পারে তার হিসেবও দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, জীববিজ্ঞানীর কাছে সমাজতন্ত্রের সমস্যা আসলে একটা আকৃতির সমস্যা! হ্যালডেন এমনই, গোটা জীবন ধরে তিনি বিজ্ঞান আর সমাজকে পাশাপাশি পেট্রিডিশে রেখে বিচার করেছেন।

ডিগ্রীর মোহ থেকে মুক্ত

কিন্তু এমনটা করতে হলে তো ক্ষমতা লাগে! হ্যালডেনের শিশুকাল তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। সেখানে মনের উপর সংস্কারের আগল ছিল না। বাবা জন স্কট হ্যালডেন ছিলেন একজন জীববিজ্ঞানী, নির্দিষ্ট করে বললে শরীরতত্ত্ববিদ। ভাবনার দিক থেকে ছিলেন উদার এবং সব সময় জোর দিতেন নিজের হাতে পরীক্ষা করে তবেই কোনো কিছু বিশ্বাস করার উপরে। ছোটবেলা থেকে বাবার বৈজ্ঞানিক কাজে সঙ্গী হতেন হ্যালডেন। দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই বাবার সঙ্গে ঢুকতেন কয়লা খনিতে, বাতাসের নমুনা সংগ্রহের জন্য। একবার হল কী, জন স্কট ভুলে গেলেন নিজের লগারিদম টেবিল সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু গণনাটা যে অকুস্থলেই হওয়া দরকার! বাবার নির্দেশে ছোট্ট হ্যালডেন নিমেষের মধ্যে কষে ফেললেন বেশ কয়েকটা সংখ্যার লগারিদমের মান! তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার বই কি!

পড়াশোনা করলেন ইটন এবং অক্সফোর্ডে। সিলেবাসে ছিল অঙ্ক এবং অবশ্যই ছিল জেনেটিক্স। কুড়ি বছর বয়সে মেরুদন্ডী প্রাণীদের জিন-বিন্যাস নিয়ে একটা গবেষণাপত্র লিখে ফেললেন। বাবার সঙ্গে যৌথভাবে হিমোগ্লোবিনের কার্যধারা সম্পর্কে একটা পেপার তৈরি করেন সেই বছরেই। এরপর নিশ্চয়ই বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন তিনি? না, এখানেই ব্যতিক্রমী হ্যালডেন। অথবা বলা উচিত, ভবিষ্যদ্বাণীর অতীত তাঁর জীবনপথ। ওই বছরেই তিনি নিজের কোর্স বদলে চলে গেলেন অতীত ইতিহাস এবং দর্শনভিত্তিক ক্লাসিক্সে। ১৯১৪ সালে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেলেন এই বিভাগে। এরপর শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। হ্যালডেনকে যেতে হল যুদ্ধে। আর কোনোদিন বিজ্ঞানের ডিগ্রী অর্জন করা হয়ে উঠল না তাঁর।

> এই ডিগ্রী লাভের প্রয়াসকে তিনি এক 'নতুন জাতপাত ব্যবস্থার' সূচনা হিসাবে দেখেছেন।

এই ডিগ্রীহীন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যে কী বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞান-গবেষণায় ডুবে ছিলেন তা জানলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুতপক্ষে ডিগ্রী সম্পর্কে সারা জীবন

ধরেই এক বিতৃষ্ণা মনে-মনে পালন করে এসেছেন তিনি। ভারতের বিজ্ঞান গবেষনার স্থথ-গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এদেশের ডিগ্রী-প্রীতিতে। এই ডিগ্রী লাভের প্রয়াসকে তিনি এক 'নতুন জাতপাত ব্যবস্থার' সূচনা হিসাবে দেখেছেন। বলেছেন, পুরনো জাতপাতের কাঠামো বিনাশের আগেই ডিগ্রী-ভিত্তিক নতুন জাতপাত ব্যবস্থা মাথা তুলেছে। প্রশ্ন তুলেছেন, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে অ্যানাটমির অধ্যাপক যদি আদতে জুলজির স্নাতক হন, স্ট্যাটিসটিক্স না পড়েই যদি সত্যেন্দ্র নাথ বসু এত বিরাট সংখ্যক পরমাণু নিয়ে তত্ত্ব তৈরি করতে পারেন, তবে ডিগ্রী নিয়ে এত মোহ থাকবে কেন? 'হোয়াট এইল্স ইন্ডিয়ান সায়েন্স' শীর্ষক এই লেখায় তিনি উদাহরণ দিয়েছেন পল ডিরাকের। যে মানুষটি ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে স্নাতক, কেমব্রিজে তিনিই গণিতের অধ্যাপক, কাজের সূত্রে আবার তাঁকেই বলা যায় ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সের বা পরিসংখ্যানবিদ্যার বিশেষজ্ঞ। হ্যালডেনের বক্তব্য, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থা কেন ইউরোপের অনুসরণে উদার হতে পারে না? অযথা ডিগ্রী-কে আবশ্যক করে মুক্ত জ্ঞানচর্চাকে আটকানো হবে কেন?

ডারউইন ও হ্যালডেন: পপুলেশন জেনেটিক্স

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে আজীবন কাজ করেছেন হ্যালডেন। তাঁর অন্যতম বই, ১৯৩২ সালে লেখা 'দ্য কজেজ অফ ইভোলিউশন' তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর দলিল। সেখানে গভীর আলোচনায় ঢোকার আগে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, প্রকৃতিতে সত্যিই কি নির্বাচন ঘটে? যদি ঘটে তবে কি তা নতুন প্রজাতি সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে? নির্বাচন ছাড়া বিবর্তনের অন্যান্য কারণ নিয়ে কি আলোচনা করা উচিত আমাদের?

এইসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্য গণিতের সাহায্য নেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন হ্যালডেন। এরপর কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গেই বলেছেন, পৃথিবীতে যে তিন জন বিবর্তনের গাণিতিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। তাই তাঁর অধিকার আছে প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করার। এই বইকেই বিশেষজ্ঞরা হ্যালডেনের 'পপুলেশন জেনেটিক্স' নিয়ে গবেষণার প্রাথমিক সারসংক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

> আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে থেকে যে সন্তান আসে, তাদের মধ্যে নানারকম জিনগত ত্রুটি তথা রোগ দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটছে? ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার ছিল না।

নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য কিভাবে বাহিত হয় তার খোঁজ করাই পপুলেশন জেনেটিক্সের লক্ষ্য। কীভাবে এই কাজটা নিয়ে এগিয়েছেন তিনি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ না আলোচনা করে বরং উল্লেখ করা যাক যে ভারতে এ ব্যাপারে কোন গবেষণা চালান তিনি। আমাদের দেশে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে বহু জায়গায়। জেনেটিক্সের তত্ত্ব বলে যে আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে থেকে যে সন্তান আসে, তাদের মধ্যে নানারকম জিনগত ত্রুটি তথা রোগ দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটছে? ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার ছিল না। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের আমন্ত্রণে হ্যালডেন ভারতে আসেন

১৯৫৭ সালে। তাঁর নানা ভাবনার মধ্যে ছিল দক্ষিণ ভারতে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহবন্ধনের জিনগত ফলাফল সমীক্ষা করা। এমন একটা সমীক্ষা বেশ বড়সড় বিস্তৃতি নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে সম্পাদন করেন হ্যালডেনের দুই ছাত্র। এর থেকে হ্যালডেন একটা নতুন পরিসংখ্যানগত পরীক্ষার কাঠামো তৈরি করেন। নিকট আত্মীয়দের মিলনে তৈরি সন্তানের সংখ্যা যখন জনগোষ্ঠীতে বাড়ছে তখন তার তাৎপর্য কি হতে পারে, তা এই পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। পরে, ১৯৬১ সালে আদমসুমারিতে, হ্যালডেনের পরামর্শে গোটা দেশ থেকে এমন তথ্য সংগ্রহ করে একটা দামী তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়।

ভারতবর্ষে এসে বেশ কিছু মেধাবী গবেষক পেয়েছিলেন হ্যালডেন। ১৯৬১ সালে স্পষ্ট করে লিখে জানিয়েছিলেন সে কথা। এঁদের মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণ দ্রোণমরাজু। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি যে হ্যালডেন মনে করতেন, জীবজগতের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের কাজকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর গাছগাছালি সম্পর্কিত গবেষণা। শুনতে অন্যরকম লাগলেও কথাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্ভিদবিজ্ঞানী জন স্টিফেন্স হেনস্লো অনুপ্রাণিত করেন ডারউইনকে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে। তিনিই বিগল জাহাজে যাত্রা করার সুযোগ করে দেন ডারউইনকে। এই অনুপ্রেরণা উদ্ভিদ সম্পর্কে স্থায়ী আগ্রহ তৈরি করে ডারউইনের মনে। বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর আকর গ্রন্থ 'অন দ্য ওরিজিন অফ স্পিসিস'-এ প্রাণীদের পাশাপাশি গাছেদের উল্লেখযোগ্য বিবরণ এই মনোভাবের ফসল।

এমন বড় গবেষণা শেষ করার পর ডারউইন আর ভারী বোঝা কাঁধে নিতে চাইছিলেন না। তিনি মনোনিবেশ করেন উদ্ভিদের উপর। অর্কিডের পরাগসংযোগ নিয়ে সহজ অথচ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা তাঁর বিবর্তনবাদকেই পুষ্ট করে। এমন কাজ থেকেই তৈরি হয় তাঁর বই 'দ্য এফেক্টস অফ ক্রস অ্যান্ড সেল্ফ ফার্টিলাইজেশন ইন দ্য ভেজিটেবল কিংডম'(১৮৭৬) এবং 'ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ফ্লাওয়ারাস অন প্লান্টস অফ দ্য সেম স্পিসিস'(১৮৭৭)। গাছের শাখাপ্রশাখার চলন বা বৃদ্ধির অভিমুখ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন ডারউইন। তার থেকেও তৈরি হয় বই। সব বইতেই জোর দেওয়া ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর। দেখানো হয়েছিল কীভাবে একটা আদি রূপ থেকে গাছের ফুল বা আকর্ষ বিবর্তিত হয়েছে টিকে থাকার প্রয়োজনেই। তবে প্রত্যেকটা তাত্ত্বিক মন্তব্যের জন্য প্রচুর সংখ্যক পর্যবেক্ষণ বা অবজার্ভেশন করতেন ডারউইন।

যোগ্য শিষ্য ছিলেন হ্যালডেন। বিপুল পরিমাণ পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে পাওয়া তথ্যকে পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করে তবেই সিদ্ধান্তে আসতেন তিনি। পরীক্ষাগুলোও হত বেশ মজার। একবার তাঁর ছাত্র এস. কে. রায় নির্দেশ পেলেন কেঁচোর কাজের ফলাফল মাপার। কেমন সেটা? এক একর জমিতে কেঁচোর দল কতটা মাটি উপরে তুলে আনে এবং তার প্রভাব কী হয় এটাই ছিল পরীক্ষার লক্ষ্য। অন্য এক পরীক্ষায় দ্রোণমরাজুকে বলা হল প্রজাপতিদের পছন্দ বুঝতে। কেমন রঙের ফুল পছন্দ করে তারা এবং উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে এই পছন্দ কোনো ভূমিকা পালন করে কিনা এটা জানাই ছিল উদ্দেশ্য। হ্যালডেন বলতেন যে এমন পরীক্ষা পুরোপুরি ডারউইনের পদ্ধতির অনুসারী। বেঁচে থাকলে এমন পরীক্ষা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হতেন ডারউইন – এমনই বক্তব্য ছিল তাঁর।

হ্যালডেনের রাজনীতি

তাঁর জীবনীকাররা বলেন যে ছোটবেলা থেকেই নাস্তিক ছিলেন হ্যালডেন। শৈশবে এমনটা সত্যিই হওয়া যায় কিনা তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে ডারউইনের একনিষ্ঠ ভক্ত যে অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন না এটাই স্বাভাবিক। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে এমন প্রায়শই হয় যে কোনো ব্যক্তি নিজেকে 'নাস্তিক' বলে ঘোষণা করলেই শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি কমিউনিস্ট?' হ্যালডেনকে এ প্রশ্ন আলাদা করে জিজ্ঞাসা করার মানে হত না। কেননা তিনি ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্বশীল সদস্য এবং একজন চূড়ান্ত সোভিয়েতপন্থী।

> পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশের অত্যাচার থেকে মানবজাতিকে বাঁচাতে তাঁরা তাকিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে।

তিরিশের দশকেই কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি এবং ১৯৪২ সালে পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পার্টির মুখপত্র লন্ডন ডেইলি ওয়ার্কার-এ তিনি নিয়মিত বিজ্ঞানের লেখা লিখেছেন ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ভুলে গেলে চলবে না যে সেই সময়ে ব্রিটেনের বেশ কয়েকজন নামী বিজ্ঞানী যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোসেফ নীডহ্যাম, জে. ডি. বার্নাল, পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট এবং অবশ্যই হ্যালডেন। সময়টাই ছিল অন্যরকম। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশের অত্যাচার থেকে মানবজাতিকে বাঁচাতে তাঁরা তাকিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। এই সব দেশের মধ্যে অবশ্যই ছিল তাঁদের নিজেদের দেশ ব্রিটেন। আপাতভাবে তাঁরা যে বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তা হল ধনতান্ত্রিক পরিবেশে বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতার অভাব এবং বিজ্ঞানচর্চায় বৈচিত্র্যের হ্রাস। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা চিন্তা করতেন মানুষের সার্বিক শোষণ ও যন্ত্রণা নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিচালনায় কোনো ত্রুটি তাঁদের চোখে পড়ত না। এমন বিষয়ে যে কোনো তথ্যকেই তাঁরা উড়িয়ে দিতেন অপপ্রচার বলে। তাঁরা মনে করতেন যে এমন কোনো ত্রুটি স্বীকার করে নিলে মুনাফালোভী, শোষণকারী পুঁজিপতিদের সুবিধে করে দেওয়া হবে।

কিন্তু ধীরে-ধীরে বিপর্যয় ঘটছিল সোভিয়েতের অভ্যন্তরে। চূড়ান্ত স্খলন ঘটছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। ট্রফিম লাইসেঙ্কো নামে একজন উচ্চপদের বিজ্ঞানী জেনেটিক্স-কে অপবিজ্ঞান বলে আখ্যা দেন। তাঁর কথায় প্রভাবিত হন সোভিয়েত নেতারা। লাইসেঙ্কো একে-একে তাঁর বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করেন। এত অনাচার সত্ত্বেও ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বিজ্ঞানীরা আস্থা রেখে চলেন সোভিয়েত নীতিতে। এমনকি হ্যালডেনের মত মানুষ আজগুবি সব যুক্তি সাজিয়ে সমর্থন করেন লাইসেঙ্কোকে। এই কাজ নিঃসন্দেহে হ্যালডেনকে খাটো করেছে অনেকের চোখে। এই জায়গাটা থেকে অবশ্য শেষমেষ সরে আসেন হ্যালডেন। ১৯৪৯ সালে পার্টির প্রধান মুখপত্র 'মডার্ন কোয়ার্টারলি'-তে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল 'ইন ডিফেন্স অফ জেনেটিক্স'। ট্রফিম লাইসেঙ্কো যে তাঁর তীব্র পছন্দের কোনো বিজ্ঞানী নন তার আভাস দেখা যায় এই প্রবন্ধে।

ভারতে হ্যালডেন

ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছিলেন হ্যালডেন, নিজের জীবনের পরিণত পর্যায়ে এবং একটা টালমাটাল সময়ে। এ দেশকে তিনি দিয়েছেন প্রচুর। পুরোপুরি

এখানে চলে আসার আগেও তিনি বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিয়েছেন এ দেশের সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য। ১৯৫৩ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস ইন ইন্ডিয়া এক আলোচনাসভায় আহ্বান করে তাঁকে। এই প্রতিষ্ঠানই আজকের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি। যাই হোক, নিজের বক্তব্যে হ্যালডেন বলেন যে জুরাসিক যুগের কোনো প্রমাণ উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে পাওয়া যাচ্ছেনা। একুশ থেকে চব্বিশ কোটি বছর আগের এই সময়টার স্তন্যপায়ীদের সম্পর্কে তথ্য নেই। কিন্তু ভারতে এই প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। তাই মনে হয়, কোনো ভারতীয় জীবাশ্মবিদ জুরাসিক যুগের স্তন্যপায়ীদের প্রথম কঙ্কাল খুঁজে পাবেন। কী আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! মাত্র দু' দশকের মধ্যে এমন জীবাশ্ম ভারতে আবিষ্কার করলেন দেশেরই একজন ভূতাত্ত্বিক! সেটার নাম দেওয়া হল কোটোথেরিয়াম হ্যালডেনেই।

বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটকে ভালোবাসলেও সেখানে শেষ দিন পর্যন্ত থাকেন নি হ্যালডেন। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে বরানগর ছেড়ে ভুবনেশ্বর পাড়ি দেন তিনি। ১৯৬২ সালে উড়িষ্যার সরকার তাঁর জন্যই তৈরী করে দেন জেনেটিক্স ও বায়োমেট্রি সম্পর্কিত এক নতুন গবেষণাগার। এখানেই ১৯৬৪ সালে মারা যান তিনি। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর মরদেহ পাঠানো হয় কাকিনাড়া মেডিকেল কলেজে। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সর্বোচ্চ সম্মান 'কলিঙ্গ পুরস্কার' জয়ী এই বিজ্ঞানী যেমন বিজ্ঞান রহস্যের কিনারা করতে উদ্যোগী ছিলেন গোটা জীবন ধরে, তেমনি আগ্রহী ছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান চড়িয়ে দিতে। তাঁকে বোঝার জন্য এমন ছোট্ট নিবন্ধ যথেষ্ট নয়, এ বড়জোর নিবিড় হ্যালডেন-চর্চার প্রাথমিক ধাপের একটা প্রস্তরখন্ড হতে পারে।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/06/07/the-wonder-that-is-haldane/
(লেখাটি ৭ জুন ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

ছবি: এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

১৭ পাতার ধাঁধার উত্তর

এক কথায়, উত্তর হল: হ্যাঁ, তিনি পারবেন। আর তার পথটা হবে ঠিক উপরের ছবির মত। ছবিটাতে, যদি ধরি (০, ০) থেকে যাত্রা শুরু, তাহলে ওই আট বাহুযুক্ত গলিগনটাকে প্রকাশ করা যায় নীচের স্থানাংকের দ্বারা -

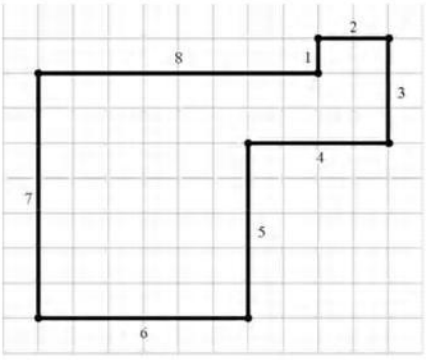

(০, ০), (০, ১), (২, ১), (২, -২), (-২, -২), (-২, -৭), (-৮, -৭), (-৮, ০), (০, ০)

এবার সমাধানটা একটু ভেঙ্গে বলি। x-অক্ষ বরাবর যদি বিজোড় সংখ্যক দূরত্ব গুলি নিই, তাহলে y-অক্ষ বরাবর থাকবে জোড় সংখ্যক দূরত্ব গুলি। x-অক্ষ বরাবর ১, ৩, ৫, ৭, ... আর y-অক্ষ বরাবর ২, ৪, ৬, ... ইত্যাদি। যেহেতু প্রফেসর ক্যালকুলাস আবার সেই শুরুর বিন্দুতে ফিরে আসবে, তাই ১, ৩, ৫, ৭, ... ও ২, ৪, ৬, ... এর মাঝে + আথবা – বসিয়ে ০ করতে হবে। + ১ – ৩ – ৫ + ৭ = ০ আর + ২ – ৪ – ৬ + ৮ = ০, এই ক্রম নিলে পথটা পাওয়া যায়।

অবশ্য, শুধু একটা নয়, এরকম অসংখ্য পথ পাওয়া যাবে। প্রতিবারই বাহু সংখ্যা হবে ৮ এর সরল গুনিতক। কারণ এরা এমন পূর্ণসংখ্যা n যার জন্য + কি – উপযুক্ত জায়গায় বসিয়ে এই সমীকরণটা খাটে:

$\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm \ldots \pm (n-1) = 0 \quad \pm 2 \pm 4 \pm \ldots \pm n = 0$

নীচে একটা ১৬ বাহু-ওয়ালা গলিগনের ছবি দেওয়া হল। ১৬টা বাহু আছে, এমন গলিগন তৈরী করা যায় ২৮ ভাবে। নীচের যে তিনটে ছবি দেওয়া হল, সেগুলোর বাহু পরস্পরকে ছেদ করবে না। কিন্তু বাকি ২৫ টার বাহু পরস্পরকে ছেদ করবে।

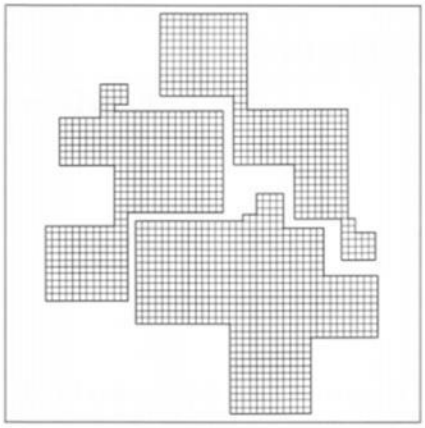

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- ❑ প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ❑ ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ❑ ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।